ফকিরের পাথর

নাট্যগুচ্ছ

মন্মথ রায়

অটো-প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড (মাণিকতলা)
কলিকাতা—৬

মন্মথ রায়ের

ফকিরের পাথর

নাট্যগুচ্ছ

অটো-প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস কর্তৃক
প্রথম প্রকাশ জুন ঃ ১৯৫৯

পরিবেশক প্রকাশনী
৪৯ বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রী পূর্ণজ্যোতি ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর
অটো প্রিণ্ট এণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯, বলদেওপাড়া রোড, কলিকাতা-৬

মূল্য
আড়াই টাকা

॥ প্রত্যেকটি নাটিকার প্রত্যেকটি চরিত্র কাল্পনিক ॥

ফকিরের পাথর

নাট্যগুচ্ছ

শ্রীমতী কল্যাণী রায়

ও

শ্রীমান চন্দন রায়কে

স্নেহাশীষ

আশীর্বাদক

মন্মথ রায়

১লা জুন ১৯৫৯

ফকিরের পাথর

নাট্যগুচ্ছ

সূচীপত্র

ফকিরের পাথর

চরিত্র

সদাশিব—	...	...	অন্ধচাষী।
গণেশ—	...	...	ঐ বড় ছেলে।
কার্তিক—	...	...	ঐ ছোট ছেলে।
গঙ্গা—	...	...	সদাশিবের স্ত্রী।
কলাবতী—	...	...	গণেশের স্ত্রী।

(চৈত্র-সংক্রান্তি। অন্ধচাষী সদাশিব তাহার কুটীর-প্রাঙ্গণের এক কোণে যষ্টিহস্তে দণ্ডায়মান। গ্রামে চৈত্র-সংক্রান্তির মেলা বসিয়াছে। গাজনের বাদ্য ভাসিয়া আসিতেছে। সদাশিব উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতেছে।

সদাশিবের স্ত্রী গঙ্গা ঘর হইতে কুলার উপর রক্ষিত একটি বিশালকায় মসৃণ নুড়ি আনিয়া উঠানের ঠিক কেন্দ্রস্থলে রাখিল এবং পুনরায় ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। প্রাঙ্গণস্থিত তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়া সদাশিবের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ কলাবতী শঙ্খধ্বনি করিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল। শঙ্খধ্বনি শোনামাত্র সদাশিব যষ্টির সাহায্যে ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে গিয়া দুর্ভাগ্যবশতঃ পাথরটিতে হোঁচট খাইয়া ভূপতিত হইল।)

কলাবতী॥ শীগ্‌গির এসো মা, শীগ্‌গির এসো।

গঙ্গা॥ (ঘর হইতে) কি হল ?

কলাবতী॥ ফকিরের পাথরে হোঁচট খেয়ে বাবা পড়ে গেছেন!

গঙ্গা॥ সে কি!

(গঙ্গা স্বামী সদাশিবের নিকট ছুটিয়া আসিল এবং কলাবতীর সহযোগে সদাশিবকে তুলিয়া আনিয়া বারান্দায় বসাইল)

গঙ্গা॥ ধন্যি লোক, ভাঙবে তবু মচ্‌কাবেনা। চোখে দেখেনা তবু বলবে দেখি।

কলাবতী॥ চোট পেলেও মুখ বুজে থাকবেন।

সদাশিব॥ যতটা চোটপাট তোমরা করছ ততোটা চোট আমার লাগেনি।

কলাবতী॥ বাবার নাম সদাশিব। শিবের মতোই হজম করেন সব বিষ।

সদাশিব॥ তোমার শাশুড়ীর নাম গঙ্গা—পরশ পেলেই জুড়িয়ে যায় সব জ্বালা—বুঝলে মা কলাবতী।

গঙ্গা॥ চোখে দেখেনা—তবু বলে দেখি। এ হয়েছে আমার এক জ্বালা।

সদাশিব॥ যাদের চোখ আছে তারাও কিছু কম হোচট্ খাচ্ছেনা গঙ্গামণি!

গঙ্গা॥ নাও থামো। কানা না হয়ে বোবা হলে আমি বাঁচতাম। চোত্ সংক্রান্তির পয়মন্ত দিনে ফকিরের পাথর খেল তোমার লাথি! সর্বনাশ না হলে বাঁচি।

কলাবতী॥ তুমি কি বলছ মা?

গঙ্গা॥ বলবো না। কত বড় একটা ঘাট হলো বল্ দেখি? ফকিরের পাথরটা তুলে নিয়ে যা দেখি পুন্যি পুকুরে—চুবিয়ে আন। দেখ তো তাতে যদি শোধন হয়, অশুদ্ধটা শুদ্ধ হয়।

(কুলাসমেত পাথরটি লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল কলাবতী)

সদাশিব॥ গঙ্গা কিনা—রাজ্যের যত পাপ জমা হচ্ছে বুকে। পরকে শোধন করেন, কিন্তু নিজে অমন অশুচি।

গঙ্গা॥ আমায় বলছ!

সদাশিব॥ তোমায় না তো কাকে! নিজে অশুচি বলে সবাইকে মনে কর অশুচি। তাই হাতে নিয়েছ ঝাঁটা—আর গোবর জলের ঘটি। এই নিয়েই আছো।

গঙ্গা॥ আমি অশুচি!

সদাশিব॥ হ্যাঁ, যখন চোখ ছিল, তখন দেখিনি। এখন চোখ নেই বলে দেখতে পাচ্ছি।

গঙ্গা॥ কি দেখছ? বল, কি দেখছ, নইলে আজ তোমার রক্ষে নেই।

সদাশিব ॥ . মুখে বলতে বাধে। চোখ বুজে ভাব।

গঙ্গা ॥ (হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল) তবে কি আজও তুমি আমায় ক্ষমা করনি!

সদাশিব ॥ আমি ক্ষমা করেছি। ভালবেসেই পাঁক থেকে তোমায় তুলে এনেছি ঘরে। কিন্তু, তুমি কেন তোমায় ক্ষমা করতে পারছ না গঙ্গামণি? যখন আমি তোমায় মাথায় নিয়েছি—ছেলেরা তোমায় মাথায় রেখেছে। ভুলে যাও যা কোন কালে হয়ে গেছে—এগিয়ে চল শুদ্ধ মনে, সামনে—

গঙ্গা ॥ শুদ্ধ হতেই তো চাই—কিন্তু পারছি কই? পারছি কই?

(কুলোতে ফকিরের পাথর লইয়া কলাবতী আসিয়া দাঁড়াইল)

কলাবতী ॥ এই যে মা, পুন্যিপুকুরে চুবিয়ে আনলাম ফকিরের পাথর।

গঙ্গা ॥ জায়গায় রাখ। আমি পঞ্চগব্য তৈরি করে আনছি।

(গঙ্গা ভিতরে চলিয়া গেল। কলাবতী পাথরটি প্রাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া শ্বশুর সদাশিবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল)

কলাবতী ॥ পাথর নিয়েই আজ দিনটা গেল বাবা। চোত্ সংক্রান্তির এতবড় একটা মেলা হচ্ছে গাঁয়ে। কেউ নিয়ে গেল না আমায়। আজ দিনটাই কেমন পাথর হয়ে গেল বাবা। কোথা থেকে কেমন করে এ পাথর এলো ঘরে জানিও না ছাই।

সদাশিব ॥ তোর মা তোকে বলে নি কলাবতী?

কলাবতী ॥ না বাবা।

সদাশিব ॥ আমার বড় ব্যাটা তো গোবর গণেশ। তাই নিজেরই মনে আছে কি না কে জানে। কিন্তু ছোট ব্যাটা? তোমার পেয়ারের দেওর কার্তিক ঠাকুর? চুপি চুপি এত কথা তোকে বলে। এটা গেল চেপে?

কলাবতী ॥ হ্যাঁ বাবা—চেপেই গেছে। আজ আমি তাকে দেখে নেব—জেনেও নেব সেই সঙ্গে। তুমি ঘরে যাবেনা এখন? শোবার সময় হয়েছে তো বাবা।

সদাশিব ॥ কার্তিক ঠাকুর এলো বুঝি ?

(দেখা গেল সত্যিই কার্তিক প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহার চোখে ইশারা)

চল্—আমাকে বিছানায় নিয়ে চল্।

(ভিতরে যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে হঠাৎ দাঁড়াইয়া গেল এবং কলাবতীর মুখের কাছে মুখ আনিয়া বলিল।

পায়ের শব্দ আমি চিনি। (চীৎকার করিয়া উঠিল) এই ব্যাটা কার্তিক, চোরের মতো দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন ? সামনে আয়।

(কার্তিক ভীতপদে সামনে আসিয়া দাঁড়াইল)

চোত্ সংক্রান্তির মেলায় গিয়েছিলি ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ—গিয়েছিলাম।

সদাশিব ॥ ভেঁপু কিনেছিস্ ?

(কার্তিক ভেঁপু বাজাইল। সদাশিব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল)

আমি দেখেছি—আমি দেখেছি। নাগরদোলা ঘুরছে—মেঠাই মণ্ডা খাচ্ছে লোকেরা—শাঁখা-সিঁদুর শাড়ী কিনছে মেয়েরা। তোরা দু'ভাই ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে ঘুরে তাই দেখছিলি—আর আমি দেখছিলাম ট্যাঁক তোদের ফাঁকা। ঠিক নয় ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ বাবা।

সদাশিব ॥ শেষে চুরি করতে ইচ্ছা হলো তোর ? হলো তো ?

কার্তিক ॥ (চীৎকার করিয়া) বাবা !

সদাশিব ॥ না-না চুরি তুই করিসনি আমি জানি। কিন্তু চুরির ইচ্ছাটাতেই পাপ হয়েছে তোর। আজ রাতে চাঁদ উঠতেই ফকিরের পাথর ঘিরে তোরা সব বসবি। মনে মনে যে বর চাইবি—সকলের চাওয়া যদি এক হয়—বরটা মিলবে। কিন্তু তার আগে ঐ পুন্যি-পুকুরে ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে আয় তুই।

(সদাশিব ঘরে ঢুকিবার জন্ম ঘুরিয়া দাঁড়াইল। কলাবতী তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। কার্তিক কিন্তু ডুব দিতে গেল না—দাওয়ায় বসিয়া তাল-

পাতার বাঁশীটি বাজাইতে লাগিল। এমন সময় আসিল গণেশ। তাহার হাতে মেলা হইতে সন্তক্রীত একটি কাস্তে। গণেশ আসিয়াই সোজা চলিয়া গেল ফণিমনসার গাছটির কাছে)

গণেশ ॥ এই কাতিক, দেখছিস্? (কাস্তেটি দেখাইল)

কার্তিক ॥ কাস্তে? তুই কিনেছিস দাদা?

গণেশ ॥ কেনবার পয়সা যদি থাকত ভাই—তবে কাস্তে কিনতাম না। কিনতাম এক লহোর পুঁতির মালা।

কার্তিক ॥ কেন, চেয়েছে বুঝি?

গণেশ ॥ সেটা তোমাকে আমার বলবার কথা নয়। যেটা তোমার শোনবার কথা—শোনো। জমির মালিক—আমার মনিব—খুশি আমার কাজে। কিনে দিল এই কাস্তে। কিন্তু শোনো—মালিকের ফসল কাটবার আগে আমি কাটব তোমার এই ফণিমনসার কাঁটাগাছ।

কার্তিক ॥ (চীৎকার করিয়া ছুটিয়া গেল) দাদা!

গণেশ ॥ কেন কাটব না রে কার্তিক। পাঁচকাঠা জমিতে বাড়ী আমার। মাটির শোকে মরি। নিজের এক রত্তি জমি পেলে প্রাণভরে চাষ করি। এই জঞ্জাল কেটে কেন লাগাবনা এখানে দুটো ধনে পাতার গাছ—লঙ্কার চারা?

কার্তিক ॥ জঞ্জাল এটাকে তুমি কি বলো দাদা, কেমন একটা শোভা? কেমন ফুল ফুটবে এই ফণি মনসা গাছে?

গণেশ ॥ ফুটুক ফুল, তবু আমি কাটব।

কার্তিক ॥ ফুল যদি কাটবে তবে তোমার বৌটাকে আগে কাটো।

গণেশ ॥ এটা তুই বড় জবর কথা বলেছিসরে ভাই কার্তিক। যাঃ তোর ফণিমনসা গেল বেঁচে। (কাস্তেটা তার সামনে ফেলিয়া দিয়া) চালায় গুঁজে রাখ্। আমি চললাম পুন্যিপুকুরে ডুব দিতে। আজ চোত্ সংক্রান্তির রাতে চাঁদ উঠতেই ফকিরের পাথর ঘিরে বসবে আমাদের আসর। চাইব আমরা বর। খেয়াল আছে তোর?

কার্তিক ॥ খেয়াল আছে। কেন থাকবেনা দাদা? কিন্তু হাজার মুণির হাজার মত। তাই সাতমণ তেলও পুড়বেনা—রাধাও নাচবেনা।

গণেশ ॥ কেন—কেন! এটা তুই কি বলছিস্ কার্তিক?

কার্তিক ॥ কেন বলব না। এমনি আরো দু'টো বছর তো দেখলাম। বাড়ীটাতে ছিলাম আমরা চারটা লোক। বুড়োটা বুড়িটা—তুই আর আমি। পাথরে হাত দিয়ে একটা মন একটা প্রাণ হয়ে চাইতে হবে একটা জিনিষ। গেল দু'বার তা হলো না। এবার তো আমরা পাঁচটা লোক। বোঝার উপর শাকের আঁটি ঐ বউটা।

গণেশ ॥ তা' বটে! কারো মনের সঙ্গে কারো মনের মিল নাইরে কার্তিক। হাড়ে হাড়ে সেটা বুঝছি। (হঠাৎ চিৎকার করিয়া) কিন্তু মনের মিল হতেই হবে। আমি পুকুরে ডুব দিয়ে আসি। তারপর দেখবি এখন। চাওয়াটা এক না হলে আজ আমি কাউকে রেহাই দেব না—ঠেঙাব।

(গণেশ ছুটিয়া চলিয়া গেল)

কার্তিক ॥ (ভেঁপুবাঁশের ফাঁকে ফাঁকে)

ফণীমনসা—ফণীমনসা।
মনে আমার কত আশা।
তোমার পাতায় কাঁটা আছে,
বুকে আমার বিঁধে গেছে।
এই আমার ভালবাসা।
ফণীমনসা! ফণীমনসা!

(কলাবতী অন্তরালেই দাঁড়াইয়া দুই ভাইয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল। এবার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল)

কলাবতী ॥ এই! ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছ কেন? জান না—বাবা ঘুমোচ্ছেন?

কার্তিক ॥ আরে—সে তো দিনরাতই ঘুমোচ্ছেন। চোখ না থাকার সুবিধাই ঐ।

কলাবতী ॥ না, না, চেঁচিওনা। চোখ নেই বলে এখন আবার কানে শোনেন বেশি। ফিস্ ফিস্ করেও কিছু বলো—জানবে উনি সব শুনছেন। বিপদ দেখ! কব্‌রেজ দেখাও না কেন?

কার্তিক ॥ কব্‌রেজ বলে এ রোগের ওষুধ নেই।

কলাবতী ॥ তবেই বিপদটা বোঝ। কিছু লুকোন থাকেনা ওর কাছে।

কার্তিক ॥ তেত্রিশকোটি দেবতা—আর একটি বেড়েছেন। তাতে কি হয়েছে। এই নাও তোমার পুঁতির মালা।

(মালা পরাইয়া দিল)

কলাবতী ॥ (উজ্জ্বল হইয়া) এ্যাঁ। এনেছ! মেলা থেকে?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ। আমার জন্য এই ভেঁপু আর তোমার জন্য এই মালা।

কলাবতী ॥ দাম জুটলো কোত্থেকে?

কার্তিক ॥ না, না, চুরি করিনি। মহাজনের বাড়ীতে মজুরী খাটার দরুন আগাম নিয়ে, আনলাম কিনে।

কলাবতী ॥ তোমার দাদাও কি এনেছে?

কার্তিক ॥ সে এনেছে কাস্তে। তোমাকে কাটতে।

কলাবতী ॥ আমাকে নয়—তোমাকে।

কার্তিক ॥ না, না, তোমাকে। তুমি ঐ ফণীমনসা যে।

কলাবতী ॥ হুঁ?

কার্তিক ॥ হ্যাঁ। গাছটা না পায় জল—না পায় সার। কিন্তু তবু কেমন লক্ লক্ করে বেড়ে উঠছে। কত রূপ, কত রস ওর পাতায় পাতায়।

কলাবতী ॥ আর কাঁটা? ছুঁতে যেওনা—হাতে বিঁধবে। দূর থেকেই দেখো।

(গঙ্গার প্রবেশ)

গঙ্গা ॥ কার্তিক এসে গেছিস্? গণেশ কই?

কার্তিক ॥ সে ডুবতে গেছে।

গঙ্গা ॥ তুই যাবিনা? বৌমা—তুমি তো বিকেলেই নেয়েছ। তুই যা কার্তিক। নোংরা থেকে ফকিরের পাথর ছোঁয়া চলবেনা।

(পাথরের সামনে যাইয়া করজোড়ে)

শুদ্ধ থেকো বাবা—শুদ্ধ থেকো। ফকিরের পাথর—আমাদেরও শুদ্ধ রেখো। তুই যা কার্তিক। ডুবটা দিয়ে আয়।

কার্তিক ॥ তুমি আমাদের মা গঙ্গা। (তাহাকে ছুঁইযা) তোমাকে ছুঁলেই তো সব শুদ্ধ। এখন কি খেতে দেবে দাও। শিবের গাজনে নেচে এলাম। ভারী ক্ষিদে পেয়েছে মা!

গঙ্গা ॥ না, না, রাতে উপোস থেকে পাথর ছুঁতে হবে যে। কচি বৌটা সারাদিন উপোস করছে—আর তুই ক্ষিদেতে নেতিয়ে পড়ছিস কার্তিক?

কার্তিক ॥ পেটে ক্ষিদে—মুখে লাজ আমার নেই মা। সে রয়েছে তোমার ঐ কচি বৌএর।

গঙ্গা ॥ লাজই হোক আর অলাজই হোক—উপোস থাকতেই হবে আজ—যতক্ষণ না চাঁদ উঠছে।

(গঙ্গা ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল)

কলাবতী ॥ আমার পেটে ক্ষিদে—মুখে লাজ একথাটা তুমি কি বললে?

কার্তিক ॥ আমি ঠিকই বলেছি বৌ। পুঁতির মালাটা পরতে শখ—তবু ঢেকে রেখেছ যে।

(গণেশের প্রবেশ)

গণেশ ॥ এই কার্তিক—যানা, একটা ডুব দিয়ে আয়।

কার্তিক ॥ বুঝলে দাদা, লোকে তোমাকে গোবর গণেশ বলে—মিথ্যা বলে না। বাড়ীতে আমাদের মা গঙ্গা। তাকে ছুঁলেই সব শুদ্ধ। যাও, যাও, ভিজে কাপড়ে থেকো না। কাপড় ছেড়ে এসো।

গণেশ ॥ তা যাচ্ছি। কিন্তু তুইও কোনখান থেকে একটু ঘুরে টুরে আয় দেখি। (কলাবতীকে) তার মানে তুমি একটু একলা থেকো—বুঝলে। আমি আসছি।

(গণেশ ঘরের ভিতর চলিয়া গেল)

কলাবতী॥ লোকটাকে আমার এত ভাল লাগে। সারাদিন অসুরের মত খাটছে—হয়রাণ হয় না একটু। আমাকে বলে—তোমার জন্য না পারি এমন কাজ নেই কলাবতী!

কার্তিক॥ তাইতো ভাবছি—আজ চোত্ সংক্রান্তির রাতে চাঁদ উঠতেই পাথর ছুঁয়ে ও হয়তো চেয়ে বসবে তোমার জন্যে এক লহর পুঁথির মালা। বিপদ হলো দেখছি। তুমি বৌ, ওটা লুকিয়ে রেখোনা, দেখিয়ে দিয়ো। ঐ যে আসছে......চাঁদ উঠতে কত বাকি আমি দেখে আসছি।

(কার্তিক বাহিরে চলিয়া গেল। গণেশ ঘর হইতে আসিযা দাঁড়াইল)

গণেশ॥ এই বৌ শোন্। পুঁতির মালাটা আমি আনতে পারিনি। তা', তুই ভাবিসনে। আজ আমি চেয়ে নেব তোর জন্য।

কলাবতী॥ না, না, পুঁতির মালা আমি পেয়ে গেছি। এই দেখ—

গণেশ॥ ও, কার্তিকটা দিয়েছে বুঝি?

কলাবতী॥ (উজ্জ্বল হইয়া) হ্যাঁ—

গণেশ॥ বটে?

কলাবতী॥ হ্যাঁ।

গণেশ॥ হ্যাঁ! যাক। আমাকে বাঁচিয়েছে। আজ ফকিরের পাথরের কাছে তবে মালাটা নয়—কিন্তু কী যে চাইব, তাওতো ভেবে পাইনা ছাই।

(ছুটিয়া আসিল কার্তিক)

কার্তিক॥ আকাশে আলো ফুটছে, চাঁদ উঠি উঠি করছে। মা, বাবা তোমরা এসো। দাদা, বৌদি তোমরা তৈরী হও—

(ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল গঙ্গা)

গঙ্গা॥ বৌমা, সঙের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। পাথরের সামনে ধুপ-ধুনো দাও। গোবরজলের ছিটে দাও। আমার ঝ্যাঁটা কোথায়? উঠোনটা ঝাঁট দিতে হয়।

(কলাবতী ছুটিয়া গিয়া একগাছা শীর্ণ ঝাটা গঙ্গার হাতে দিল এবং ধুপধুনো আনিতে ঘরে চলিয়া গেল)

গঙ্গা ॥ ঝাঁটার ছিরি দেখ। একেবারে ক্ষয়ে গেছে। কত বলি তোদের — আমাকে একটা রাম ঝাঁটা কিনে এনে দে। দিলি না কেউ। গেলবার চোত্ সংক্রান্তির রাতে এই পাথর ছুঁয়ে বসে—আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে শুধু এই ঝাঁটার কথাই মনে হলো। কপালেও জুটেছে ঝ্যাটা।

(ঝাঁটাটা লইয়া ঝাঁট দিতে লাগিল। কলাবতী ধূপ-ধুনা আনিয়া পাথরের সামনে জ্বালিয়া দিল। গণেশ ছুটিয়া গিয়া পাঁচখানা পিঁড়ি আনিয়া পাতিয়া দিল। কার্তিক ঘরে গিয়া অন্ধ সদাশিবকে ধরিয়া আনিল)

সদাশিব। বসো—বসো তোমরা সব গোল হয়ে বসো। চাঁদ উঠতে এখনো বাকি আছে। বৌমা, এবছর তুমি আমাদের মধ্যে নতুন। তাই আজ নতুন করে ফকিরের এই পাথরের কথা বলব। তিন বছর আগে পাথরটা দিয়ে যায় আমাকে এক ফকির। বলে যায়— চোত্ সংক্রান্তির রাতে চাঁদ উঠতেই এই পাথর ছুঁয়ে যে কোন একটি বর মনে মনে চাইলে তা' মিলবে। কিন্তু সকলের চাওয়াটা হওয়া চাই এক।

গণেশ ॥ ঐখানেই তো যত গোল বেঁধেছে বাবা।

সদাশিব ॥ তা বেঁধেছে। গেলো দু'বছর মেলে নি তাই কিছু। এবার আগে ভাগেই ঠিক করে নাও সকলে মিলে কি বরটি চাইবে।

গণেশ ॥ হ্যাঁ, তুমি মা আবার—রাম-ঝাঁটা চেয়ে না বসো। তুমি কি চাইবে বাবা ?

সদাশিব ॥ আমি কিছুই চাইব না এবার। পাথরে আমি হাতই দেবনা।

সকলে ॥ কেন ? কেন ?

সদাশিব ॥ আমার কিছুই চাইবার নেই। আমার মনে হয় সবই আমি না চাইতেই পেয়ে গেছি।

গঙ্গা ॥ লোকটার মাথা খারাপ হলো নাকি ? চোখ দুটো চাইবার নেই ?

সদাশিব ॥ না। চোখ আমি ফিরে চাই না। এ আমি বেশ আছি—খাসা আছি।

গঙ্গা ॥ খাসা আছ। বেশ, তবে আমি ঝাঁটাই চাইব। ঝাঁটাই বড় দরকার। নোংরা জঞ্জাল জমে রয়েছে বলেই লক্ষ্মীঠাকরুণ ঘরে আসবার পথ পান না।

গণেশ ॥ এ তুই কি বলছিস মা? নাঃ তোর মাথাও খারাপ হয়েছে দেখছি। ঘরে লক্ষ্মী নেই কেন শোন। আজ আমাদের চাষের জমি নেই। পরের জমিতে মজুর খেটে মরি দুই ভাই। মাটির বুক চিরে পাতাল থেকে টেনে তুলি লক্ষ্মী। কিন্তু সে লক্ষ্মী চলে যান যার জমি তার ঘরে। না, না, এবার আমরা জমি চাইব—নিজেদের জমি। সোনা ফলাব মাঠে। সেই সোনার শেকলে বাঁধব লক্ষ্মী। জমি চাই, আমি জমি চাই।

কার্তিক ॥ জমি! জমি! কি হবে জমি দিয়ে? গাঁয়ে কত জমিই তো পতিত পড়ে আছে। চাষ হচ্ছে কই? ঐ সব জমি আমি এক-দিনে চাষ করতে পারি যদি একটা কলের লাঙল পাই। মহেশপুরে এনেছে—কী তার ভট্ ভট্ শব্দ—যেন একটা দৈত্য। দশ বিশটা হালের কাজ একা করছে ঐ কলের লাঙলটা।

গণেশ ॥ আরে—হাঁদারাম, আগে জমি, তবে না লাঙল।

কার্তিক ॥ গোবর-গণেশ তোমাকে সাধে বলে দাদা! পেলি না হয় গোটা গাঁয়ের জমিটাই। সে তো এখনো পড়ে রয়েছে। মালিকও রয়েছে কিন্তু চাষ হচ্ছে কি? কলের লাঙলটা যদি পাই—ছুটে আসবে সব লোক আমাদের কাছে। ওদের জমি-আমাদের হাল। উঃ কী চাষটাই হবে-মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখ দাদা—

গঙ্গা ॥ থাম্—তোরা থাম্। এবার রথের মেলায় দেখলি না তোরা একটা কল। শহরের বাবুরা আনলো। তারও মুখে ভট্ ভট্ আওয়াজ—বিজলী বাতি জ্বললো—আবার এমন হাওয়া ছাড়লো এক নিমিষে উঠল ঝড়।

কার্তিক ॥ ওটাকে একটা এঞ্জিন বলল। ডিজিল ইঞ্জিন মা!

গঙ্গা ॥ চাবি তো চা' ঐ কলটা। উঠুক একটা ঝড়। নোংরা জঞ্জাল ঝেটিয়ে করুক বিদায়।

কলাবতী ॥ ঝড়টা উঠলে আমাদের কুঁড়ে ঘরটা উড়ে যাবে না মা ?

গণেশ ॥ আরে, বৌটা তো খুব খাঁটি কথা বলেছে মা।

কার্তিক ॥ না, না, মার কথাই ঠিক। তুনিয়াটা কেমন গোলমাল হয়ে গেছে। একটা দিক হয়েছে আকাশ সমান উচু আর একটা দিক হয়েছে পাতালের মত নীচু।

গঙ্গা ॥ তুই ঠিক বলেছিস্ কার্তিক। তুনিয়াটা রয়েছে মা বাসুকীর মাথায়। ভার সামলাতে পারছেননা মা বাসুকী। ঘাড়টা করছে টলমল। আমিও তো মা। চোখের উপর দেখছি, তোরা তু'তুটো জোয়ান ছেলে আমার—রাতদিন অসুরের মতো খাটছিস্। তবু তোদের ভাত জুটছে না। আর দিন দিন ফেঁপে উঠছে ঐ মালিক আর মহাজন।

কার্তিক ॥ নাঃ, উঠুক একটা ঝড়। ভেঙেচুরে সব সমান হয়ে যাক। সকলের সুখ-সুবিধা সমান হোক। আয় দাদা, আজ আমরা ঐ কলটাই চাই।

গণেশ ॥ রাখো তোমরা বড় বড় কথা। এসব কথা শহরের বাবুদের মুখে ছোট থাকতে শুনে আসছি, খালি কথা আর কথা। আসল কথা টাকা। ওসব মতলব ছাড়ো। আজ চাওয়া যাক টাকা—লাখ টাকা। গরু-বাছুর বেঁচে শ' টাকা জোগাড় করে ঘরে আনলাম বৌ। তা' কিনা তাকে—না দিতে পারি পেট ভরে খেতে—না দিতে পারি পরণের একটা ভাল শাড়ী—হাতে তু'গাছা চুড়ি। বৌ হয়ে আছে আমার, একটা মড়া কাঠ। না, না, এসো আমরা আজ চাই টাকা—লাখ টাকা।

সদাশিব ॥ শোন বেটা শোন। গোবর গণেশ শোন। আমি কি দেখছি —জানিস ? লাখ টাকা তোরা পেয়েছিস্। তুনিয়ার যে দিকটা আকাশ সমান উচু, সেখানে গিয়ে বাঁধলি বাসা। লাখ টাকাতেও ভরছে না তোদের মন, লোভ যাচ্ছে আরও বেড়ে। এল হিংসা,

এল দ্বেষ। ভাইয়ে ভাইয়ে বেঁধে গেল ঝগড়া। ছিলি তোরা মানুষ—হয়ে গেলে অমানুষ।

গণেশ॥ নাঃ, তোমার চোখ না থেকেই আমাদের হয়েছে যত বিপদ এত বেশি দেখলে—আমরা চলি কি করে?

কলাবতী॥ আপদ বিপদ না দেখতে পেলে মাড়িয়ে চলে যাওয়া যায়—দেখলেই ডিঙ্গিয়ে উঠতে পারি না বাবা।

গঙ্গা॥ সাচ্চা কথা বলেছ। মানুষটার যখন চোখ ছিল—তখন ওকে বোঝা যেত। এখন চোখ নেই—বুঝতে পারিনা ওঁকে। এযেন শিবঠাকুরের তৃতীয় নয়ন খুলে গেছে। দু'চোখে যে নোংরা আর জঞ্জাল দেখি—তাই সইতে পারি না। উনি দেখছেন তিন চোখে।

কার্তিক॥ নাঃ, এবারও দেখছি নানা মুণির নানা মত। কি চাইবে সকলে মিলে—চটপট ঠিক করো। আমি দেখে আসছি চাঁদ উঠল কি!

সদাশিব॥ (চীৎকার করিয়া উঠিল) না, না, দাঁড়া, ঐ দেখ চাঁদ উঠে গেছে। পাথর ছুঁয়ে সব গোল হয়ে বসে পড়্। চোখ বুজে মনে কর সকলে—আঁধার আলো করে আকাশে উঠছে চাঁদ। একটা বছর শেষ হলো—আরেকটা বছর আসছে। নতুন বছরে বর দেবে আজ এই ফকিরের পাথর। যা চাইতে হবে—মনে মনে চাইতে হবে। আর চারজনের চাওয়াই যদি এক হয় তবেই মিলবে বর। চেয়েছিস্; তোরা চেয়েছিস্?

অন্যচারজন॥ (এক যোগে) হ্যাঁ—চেয়েছি।

সদাশিব॥ জয় বাবা সিধু ফকির—তোমার বাক্য সত্য হোক বাবা। পাথরে মাথা ছুঁয়ে প্রণাম করে চোখ মেলে এবার সব উঠে দাঁড়াও।

(সকলের তথাকরণ)

গণেশ॥ তুমি কি চেয়েছ মা? ঝ্যাঁটা চেয়ে বসোনি তো?

গঙ্গা॥ কি জানি বাবা—কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল।

গণেশ॥ তুই কি চেয়েছিস্ বৌ?

কলাবতী॥ ভয়ে ভয়ে কি যেন চেয়েছি।

গণেশ॥ কার্তিক তুই?

কার্ত্তিক ॥ অন্ধকারটা যাতে কেটে যায়, আমি চেয়েছি তাই।

গণেশ ॥ আরে আমিও যে তাই চেয়েছি।

সদাশিব ॥ একি ! আমি যেন সব দেখতে পাচ্ছি। চোখের আলো আমি ফিরে পাচ্ছি। (সার্তনাদে) একি হলো—একি হলো আমার ! (রুদ্রমূর্তিতে) তোরা তবে সবাই আমার চোখ ফিরে চেয়েছিস্ ?

(সকলে নীরব রহিল)

অন্ধ হয়ে আমার তৃতীয় নয়ন খুলে গিয়েছিল। সেটা তোরা কেড়ে নিলি ! তোরা আমার একি সর্বনাশ করলি !

গঙ্গা ॥ না, না, এ তুমি কি বলছ ? তুমি যেন আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলে অনেক দূরে। আবার তোমায় ফিরিয়ে আনলাম ঘরে।

গণেশ ॥ তোমার দিকে তাকাতে পারতাম না বাবা। এবার পারছি। সহজ হয়েছ আজ তুমি।

কার্তিক। চোখ ছিল না, তাই আমাদের এগিয়ে যাবার পথে, তুমি দেখতে পদে পদে বাধা। এবার তোমার কাছে আর পাব না বাধা।

কলাবতী ॥ তোমাকে লুকিয়ে কিছু করবার জো ছিল না বাবা। সে ভয়টা আজ গেল। এবার তোমার কলাগাছ থেকে কলা চুরি করে খাবে এই কলাবতী। তুমি জানতেও পারবে না বাবা !

সদাশিব ॥ আমার চোখ নেই বলে তোদের যে এত দুঃখ ছিল—এতো আমি জানতাম না ! চোখ না থাকতে যে জ্ঞানটা আমি পেয়েছিলাম—সেটা আজ হারালাম। কিন্তু এই চোখ ফিরে পাওয়ায় আর একটা জ্ঞান আমার হলো। এক জোট হয়ে কিছু চাইলে—তা পাওয়া যায়—পাওয়া যায়।

(সকলকে সস্নেহে আশীর্বাদ করিতে লাগিল)

গণেশ ॥ আমরা তা পাব। কি বলিস কার্তিক ?

কার্তিক ॥ ধরে নে দাদা, ও আমরা পেয়েই গেছি। পাওয়াটা যে এতো সোজা তা' কে জানতো।

সদাশিব ॥ ফকিরের পাথরটা এবার পুন্যিপুকুরে ফেলে দিয়ে আয়।

গণেশ ॥ কেন ?

কার্তিক ॥ কেন বাবা ?

গঙ্গা ॥ তাইতো ! কথাটা ভুলেই গেছিলাম।

কলাবতী ॥ কি কথা মা ?

সদাশিব ॥ ফকিরের বাক্য পাথরটা বর দেবে শুধু একবার। এক জোট হয়ে তোরা তা আদায় করে নিয়েছিস। ফকিরের বাক্য, কাজ ফুরোলে, ফেলে দিয়ো ওকে পুকুরের জলে। ফকিরের বাক্য রাখ।

কার্তিক ॥ দাদা।

গণেশ ॥ বুঝতে আর বাকি নেই কার্তিক। হয়ে গেল।

কলাবতী ॥ কি হল ?

গণেশ ॥ কপাল পুড়ল।

সদাশিব ॥ কেন ? কেন

কার্তিক ॥ আমিও তাই বলি বাবা। কপাল পুড়বে কেন ? পাথর না হয় নাই থাকল। একজোট হওয়া নিয়ে কথা। একজোট হলেই সব মিলবে। হও দেখি এক জোট।

সদাশিব ॥ সাবাস ব্যাটা, সাবাস। পাথরটা যাক্, কিন্তু বিনা পাথরেও পাওয়ার মন্ত্রটা তোরা পেয়ে গেছিস। একজোট হয়ে ঠিক করে নে তোদের চাওয়াটা—আজই ঠিক করে নে—কিন্তু তার আগে জলে ফেলে দিয়ে আয় ফকিরের পাথর। ফকিরের বাক্য রাখ।

গণেশ ॥ রাখছি। কিন্তু আমি বলে রাখছি এবার চাই লাখটাকা।

কার্তিক ॥ শুনলে বাবা, আবার সেই লাখটাকা। যেন লাখটাকা কেউ কখনো পায়নি।

সদাশিব ॥ লাখ লাখ লাখপতি আবার পথেও বসেছে।

গঙ্গা ॥ টাকা এলেই পাপ। পাপের টাকা থাকে না, পাপের সংসার টেঁকেনা। আমি দেখেছি। আমাদের নটবর মণ্ডল—

সদাশিব ॥ থামো তুমি। পুরানো কাসন্দি ঘাটতে নেই।

কলাবতী ॥ নটবর মণ্ডল তো আমার বাপ্। সে আবার কি করল ?

সদাশিব ॥ থাম বেটি থাম।

কলাবতী ॥ থামব কেন। আমার বাপ না হয় এখন গরীবই হয়েছে, তাই বলে আমার বাপ তুলবে কেন ?

গঙ্গা ॥ তুই সেই পাপের ঝাড়। ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব তোকে। আমি একটা ঝ্যাটা চাই, রাম-ঝ্যাটা।

গণেশ ॥ এটা তুমি কি কথা বলছ মা, আমার ঘরের বৌ—তোমরাই এনে দিয়েছ !

গঙ্গা ॥ (হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া) আমি- হ্যাঁ আমিই এনেছি। কেন এনেছি আমি জানিনা।

সদাশিব ॥ আমি ওকে বুঝিয়ে বলছি। তোরা তিনজনে পাথরটা ফেলে দিয়ে আয় জলে। ফকিরের বাক্যি রাখ, যা-যা—

(কার্তিক, গণেশ ও কলাবতী পাথর পুকুরে ফেলিতে গেল)

সদাশিব ॥ নটবর মণ্ডলের কথা কি কিছুতেই ভুলতে পারনা তুমি ? কিছুতেই না গঙ্গা ?

গঙ্গা ॥ আমার তখন কচি বয়স। ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার সর্বনাশ করল লোকটা। বাবুগঞ্জের মেলা দেখাবার নাম করে বেচে দিয়ে এলো বৌ বাজারে।

সদাশিব ॥ মালা বদল করে মাথায় তুলে নিয়ে এলাম আমি। মনের মত বৌ পেলাম, মনের মতো ঘর বাঁধলাম। গণেশ এল, কার্তিক এল— সোনার সংসার গড়ে উঠল। দুঃখ-কষ্ট ছিল, কিন্তু মনে ছিল সোনা।

গঙ্গা ॥ সেই সোনা লুটতে এলো আবার সেই লোকটা—এবার ছিলনা তার টাকার জোর—ছিলনা লাঠির জোর। পরনে ছেঁড়া কাপড়, পিঠে ভিক্ষের ঝুলি, একটা কচি মেয়ে তার হাতের লাঠি কিন্তু তবু সে কি জোর ! বলে, আমায় ভিক্ষা দাও গঙ্গা।

সদাশিব ॥ এতো আমি সব জানি। তুমি লোকটাকে দিলে তাড়িয়ে, কলাবতীকে রাখলে কেড়ে। তোমার দয়ার ধরণ দেখে আমি হেসে মরি। যে করল তোমার সর্বনাশ, তারই মেয়েকে বুকে টেনে নিলে, ছেলের বৌ করে।

গঙ্গা ॥ তুমি তখন কিছু বোঝনি, না ?

সদাশিব ॥ না। বুঝলাম পরে, যখন অন্ধ হলাম—যখন আর একটা নতুন চোখ পেলাম আমি।

গঙ্গা ॥ কি বুঝলে ?

সদাশিব ॥ নটবরকেই বুকে তুলে নিলে তুমি--ঐ কলাবতীরূপে।

গঙ্গা ॥ (আর্তনাদ করিয়া উঠিল)।

সদাশিব ॥ কিন্তু, আজ আর নটবরকে তুমি সইতে পাচ্ছনা। তাই ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাইছ যত অশুচি। কিন্তু গঙ্গা, একটা ভুল করছ—তুমি। পাঁক থেকেই জন্মে পদ্ম—পূজার ফুল। আর গঙ্গা! আমার গঙ্গামণি! পাপকে হজমই যদিনা করতে পারবে তবে নাম নিয়েছিলে কেন গঙ্গা ?

(বুকে টানিয়া নিতে গেল)

গঙ্গা ॥ ছাড়ো!

(কার্তিক, গণেশ ও কলাবতী কলরব করিতে করিতে আসিয়া দাঁড়াইল)

গণেশ ॥ লাখ টাকা—

কার্তিক ॥ এ না হলে লোকে বলে গোবর গণেশ! ওসব চলবেনা, এবার চাই ঐ কলের লাঙ্গল।

কলাবতী ॥ না, না, ডিজিল ইঞ্জিন.........ভট্ ভট্ করবে, জ্বলবে বিজলী বাতি—উঠবে ঝড়।

গণেশ ॥ সে ঝড়ে তুই উড়ে যাবি বৌ।

গঙ্গা ॥ না। আমি ওকে বুক দিয়ে ধরে রাখব।

(কলাবতীকে বুকে টানিয়া জড়াইয়া ধরিল)

সদাশিব ॥ উঃ আমার চোখ দুটো—আমার চোখদুটো—

(আর্তনাদ করিয়া চোখ দুটি দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। গঙ্গা বাদে অন্য সকলেই সার্তনাদে ছুটিয়া গিয়া সদাশিবকে ধরিল)

গঙ্গা ॥ অন্ধ হলেন। আবার। মুখে বলা যায় অনেক কিছু—কিন্তু চোখে যায় না সওয়া। ......[কলাবতীকে] দূর হ— তুই আমার কাছ থেকে দূর হ।

সদাশিব ॥ না-না, কলাবতী, কাছে আয় মা। অন্ধ হয়ে আমি বেঁচে গেলাম। এবার সব মন ঠিক কর। চাইতেই যদি কিছু হয়, চাইবি শান্তি, মনের শান্তি। গঙ্গা, কাছে এস। কলাবতী, আমার তামাক দে—কাতিক গণেশ উপোস রয়েছে, ওদের খেতে দে। ...গঙ্গা, চল আমায় ঘরে নিয়ে চল। আঃ বাঁচলাম। অন্ধকার, অন্ধকারতো নয়,—আমার সামনে শান্তি পারাবার।

[সকলে সদাশিবকে লইয়া ঘরে চলিল]

যবনিকা

১৯৫৮ সালের ১৬ই অক্টোবর
'ফকিরের পাথর' নাটিকাটি আকাশবাণী কর্তৃক
ন্যাশানাল প্রোগ্রামে সারাভারতে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত
'আকাশবাণী'র সৌজন্যে এই সংকলনে প্রকাশিত।

অসীমন্তিনী

[বর্ষীয়সী ধনী ব্রাহ্মণ-বিধবা। চিন্ময়ী দেবীর বালীগঞ্জস্থিত সুরম্য বাসভবন "নারায়ণী"। রাত্রি প্রায় দশটা। চিন্ময়ী দেবী এবং তাঁহার গৃহতত্ত্বাবধায়ক রূপলাল মুখার্জী আলোচনারত।]

রূপলাল ॥ এইবার তবে, কর্তার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রের খসড়াটা আপনি শুনুন মা। কালই এটা প্রেসে ছাপতে দিতে হবে, আর সময় নেই।

চিন্ময়ী ॥ শোনাও বাবা।

রূপলাল ॥ (পাঠ) "বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমেতৎ—আগামী ১০ই আশ্বিন রবিবার আমার স্বর্গীয় দেবতা ৺নারায়ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ আমাদের বালিগঞ্জস্থিত বাসভবন 'নারায়ণী'তে অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে সারাদিন গীতাপাঠ এবং সংকীর্তন হইবে। অপরাহ্ণ হইতে দরিদ্রনারায়ণ-সেবার আয়োজন থাকিবে। আপনি সবান্ধবে শ্রাদ্ধবাসরে যোগদান করিলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি,

বিনীতা
শ্রীমতী চিন্ময়ী দেবী

চিন্ময়ী ॥ ঠিক আছে বাবা রূপলাল। তবে ঐ 'বাধিত হইব' না লিখে 'ধন্য হইব' লেখ। কর্তা তাই লিখতেন।

রূপলাল ॥ যে আজ্ঞে মা। (তথাকরণ) আর সব ঠিকই আছে—কেমন মা?

চিন্ময়ী ॥ হ্যাঁ বাবা। মোটামুটি ঠিকই আছে। খাওয়াদাওয়ার ফর্দ-টর্দগুলো আমি সাবিত্রীকে ডেকে করিয়ে নিচ্ছি।

রূপলাল ॥ তাহলে আমিও মা বসি?

চিন্ময়ী ॥ না, বাবা, তোমার আর বসতে হবে না। সাবিত্রী ওসব একাই পারবে। দেখছি তো, খুব কাজের মেয়ে আমার সাবিত্রী।

রূপলাল ॥ তা যা' বলেছেন। দোষের মধ্যে একটু 'বাঙাল'।

চিন্ময়ী ॥ তা' হোক। এই ক'মাসেই কথায় বাঙাল টানটা গেছে। কাজকর্মে আমাদের সবাইকে খুব খুশী করেছে। আমার আনন্দ যে একজন দুঃখী-বিধবা উদ্বাস্তুকে আশ্রয় দিতে পেরেছি। তুমি বলেছিলে বাবা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভালো লোক পাওয়া যায় না। গেছেতো?

রূপলাল ॥ 'একটি বৃহৎ সংসারের রন্ধনাগারের তত্ত্বাবধানের জন্যে একজন বিধবা ব্রাহ্মণ মহিলা চাই'—শুধু এইটুকু বিজ্ঞাপন দিলে সাবিত্রীকে আপনি পেতেন না মা। ঐ বিজ্ঞাপনে 'কর্মঠা সুরুচিসম্পন্না যুবতী হওয়া চাই' এই কথাগুলো আমি জুড়ে দিয়েছিলাম বলে আপনি অমন করিৎকর্মা মেয়েটি পেয়েছেন; আর তা ছাড়া মোটা বেতন আর নিখরচায় খাওয়া পরার ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে সেখানে ভালো লোক কেন পাবেন না মা!

চিন্ময়ী ॥ এই কে আছিস—সাবিত্রীকে ডেকে দে। আচ্ছা তুমি তবে এস বাবা।

রূপলাল ॥ আর তো আমার কোনো কাজ-টাজ নেই মা? মনে করে দেখুন।

চিন্ময়ী ॥ কিছু তো মনে পড়ছে না এখন। তা' তুমি আফিস ঘরে আরো তো কিছুক্ষণ থাকছ—যদি দরকার হয় ডাকব।

রূপলাল ॥ (হাতঘড়ি দেখিয়া) রাত সাড়ে ন'টা বেজে গেল। রাত দশটা পর্যন্ত তো আছিই, তারপরেও হয়ত আমাকে থাকতে হবে আজ।

(সুদর্শনা সাবিত্রীর প্রবেশ। রূপলাল প্রস্থানকালে তাহাকে একবার আড়চোখে দেখিয়া গেল)

সাবিত্রী ॥ আমাকে ডেকেছেন মা!

চিন্ময়ী ॥ হ্যাঁ মা সাবিত্রী, ডেকেছি। আসছে রবিবার এ বাড়ির সবচেয়ে পবিত্র অনুষ্ঠানটি হবে।

সাবিত্রী ॥ জানি মা, কর্তার বার্ষিক শ্রাদ্ধ।

চিন্ময়ী ॥ না মা, এতে সব কথা বলা হল, না। লোকে বলে শ্রাদ্ধ, কিন্তু আমি বলি পূজা। মেয়েদের সবচেয়ে বড় দেবতা স্বামী। তার উপর, আমার স্বামীর নামও ছিল নারায়ণ।

সাবিত্রী ॥ জানি মা।

চিন্ময়ী ॥ আমার কাছে সাক্ষাৎ নারায়ণই তিনি ছিলেন মা। যেমন ছিল রূপ, তেমনি ছিল গুণ। আমি আমাব সেই নারায়ণ হারিয়ে কি করে যে বেচে আছি, ভেবে পাইনা মা। ছেলেপুলে নেই, সে দুঃখ করিনা সাবিত্রী—

সাবিত্রী ॥ কিন্তু আমাদের দুঃখ হয়। এত বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করবে কে মা!

চিন্ময়ী ॥ কারা ভোগ করবে তার নির্দেশ অন্তিম' কালে তিনিই দিয়ে গেছেন সাবিত্রী। তাঁর সেই কথাগুলো এখনও কানে বাজছে।

(চোখ বুঁজিযা কথাগুলি যেন শুনিতে লাগিলেন।)

সাবিত্রী ॥ কি বলেছিলেন মা?

চিন্ময়ী ॥ (যেন তাঁহাব ধ্যান ভাঙিল) বললেন, সবই নাবায়ণের ইচ্ছা চিন্ময়ী। তুমি যে আজ বিধবা হ'চ্ছ এও তাঁরই ইচ্ছা। বিধবাই বিধবার দুঃখ বুঝবে। অনাথ বিধবাদের দুঃখ তুমি দূর করো চিন্ময়ী। আব ছেলে-মেয়ে নেই—এ কোনো দুঃখ নয়। দেশে অনাথ আতুরের অভাব নেই—তারাই তোমার ছেলে মেয়ে।

সাবিত্রী ॥ আপনাব জীবনে কথাটা খুবই সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মা।

চিন্ময়ী ॥ তা' হয়েছে কিনা জানিনা। তবে এটা ঠিক আমারএত বড় সংসারের ভার নেবার জন্যে আমি কোন সধবা মেয়ে চাইনি— চেয়েছিলাম একটি বিধবা। তুমি বিধবা বলেই মা, বিধবার দুঃখ এত বোঝ। বোঝ আমারও দুঃখ। জীবনে দুঃখ না পেলে দুঃখীর ব্যথা কেউ বোঝে না—এ আমি দেখেছি।

সাবিত্রী ॥ আমাকে আপনি কেন ডেকেছেন মা?

চিন্ময়ী ॥ ও, হ্যাঁ, রবিবারের খাওয়া দাওয়ার ফর্দটা তুমি সেরে ফেল মা।

সাবিত্রী॥ কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার কিছু নিবেদন করবার আছে। আপনি না ডাকলেও আমাকে এই জন্যেই আসতে হ'ত আজ।

চিন্ময়ী॥ কি কথা! বল মা বল!

সাবিত্রী॥ আমি আপনার কাছে বিদায় চাইছি মা।

চিন্ময়ী॥ সে কি! সেকি সাবিত্রী!

সাবিত্রী॥ হ্যাঁ মা এখান থেকে বিদায় নিলে বড় বেশী দুঃখে পড়তে হবে আমি জানি, তবু আমি বিদায় না চেয়ে পারছি না।

চিন্ময়ী॥ আশ্চর্য! কি হয়েছে সাবিত্রী! আমাকে খুলে বল মা!

সাবিত্রী॥ সে কথা বলতে মুখে বাধে।

চিন্ময়ী॥ কেউ কি তোমাকে অপমান করেছে সাবিত্রী? না-না চুপ করে থেকো না, উত্তর দাও মা।

সাবিত্রী॥ উত্তর দিলে আপনি মনে বড় আঘাত পাবেন মা।

চিন্ময়ী॥ কিন্তু তুমি চলে গেলে যে আঘাত আমি পাব, কোন আঘাতই তার চেয়ে বেশী হতে পারে না সাবিত্রী। বল, কে তোমায় অপমান করেছে—কি অপমান?

সাবিত্রী॥ ঐ রূপলাল বাবু--

চিন্ময়ী॥ ও। মোক্ষদা আমাকে একটা আভাস দিয়েছিল বটে একদিন। কথাটা বিশ্বাস করিনি। উল্টে মোক্ষদাকেই দিয়েছিলাম ধমক। এখন বুঝছি, মোক্ষদা তবে মিথ্যে বলেনি। কে আছিস?—রূপলালকে ডেকে দে। স্বামীর স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকে বিধবা। তার সেই ধ্যান, সেই পুজোয় বাধা দেয় যে দুশ্চরিত্র লোক, তাকে আমি কখনও ক্ষমা করতে পারি না—কখন না। সে হয়ত এসে বলবে তোমার কথা মিথ্যা; কিন্তু আমি জানি, মেয়েদের অসম্মানের কথা মেয়েরা যখন নিজমুখে বলে তখন তাদের মাথা কাটা যায়—তাই সত্য না হ'লে মেয়েরা কখনো অসম্মানের কথা নিজ মুখে বলে না।

(সাবিত্রী চোখে আঁচল দিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। রূপলাল আসিয়া দাঁড়াইল)

রূপলাল ॥ আমাকে স্মরণ করেছেন মা!

চিন্ময়ী ॥ তোমাকে আমি বিদায় দিচ্ছি রূপলাল—আজই। এখনি তুমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। তোমার যা পাওনা, আমি হিসেব করে কালই তোমাকে পাঠিয়ে দেব তোমার বাড়ি।

রূপলাল ॥ আপনি আমার ওপর এত নিদয় হচ্ছেন কেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মা!

চিন্ময়ী ॥ ঐ সাবিত্রীব চোখের জল দেখেও কি তুমি কিছু বুঝতে পারছ না রূপলাল?

রূপলাল ॥ বুঝলাম। সাবিত্রী তবে আমার নামে আপনাব কাছে নালিশ করেছে। হয়ত বলেছে, আমি তাকে অপমান করেছি।

চিন্ময়ী ॥ তুমি সাবিত্রীর আঁচল ধরে টেনেছ—গায়ে হাত দিতে গেছ—মোক্ষদা নিজে দেখে আমাকে বলেছে। সেদিন আমি বিশ্বাস করিনি। বলেছিলাম, এ কথা কখনই সত্য নয়, এ সব সইবার মেয়ে সাবিত্রী নয়—এ যদি এতটুকু সত্য হ'ত, ঐ সাবিত্রী এসে নিজের মুখে আমাকে তা বলতো। আজ সে তা বলেছে।

রূপলাল ॥ হ্যাঁ, আজ বলবারই কথা। আপনি যাকে মনে করছেন সতী সাধ্বী সাবিত্রী, আমি তাকে বলি কুলটা।

চিন্ময়ী ॥ (রাগে চিৎকাব করিযা) রূপলাল, মুখ সামলে কথা বলবে আমার সামনে।

রূপলাল ॥ কুলটা বলেই তাকে আমি মাঝে মাঝে শাসন করতাম। ফল হ'ল তাব আজ এই! কিন্তু সত্য চাপা থাকে না মা। সত্যকে ঢাকবার সাধ্য নেই ঐ কুলটার।

চিন্ময়ী ॥ (ভীষণ উত্তেজনায) বেবিয়ে যাও—বেবিয়ে যাও এখনি এখান থেকে—

রূপলাল ॥ যাচ্ছি মা, যাচ্ছি। (পকেট হইতে একখানি খোলা খাম বাহির করিয়া তাহাব ভিতব হইতে একটি চিঠি বাহিব কবিযা) আমাকে

দেখতেই ভয় পেয়ে আঁচলে বাঁধতে দেখি নামধামহীন এই পত্রটা, আর সে পত্রটা হচ্ছে এই :

'আসছে বৃহস্পতিবার ঠিক রাত সাড়ে দশটায় আমি তোমাদের বাগানে খিড়কির দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি এসো।'

আজ সেই বৃহস্পতিবার। সাড়ে দশটাও বেজেছে। এই মুহূর্তটির অপেক্ষাতেই আমি বসেছিলাম আপিসে। আপনার এখানে ইনি আটক বলে যেতে পারেননি অভিসারে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। (সাবিত্রীকে) আপনার লোকটিকে এখানে ধরে আনবার জন্য দারোয়ানকে হুকুম দিয়ে তবেই আমি এখানে এসেছি, সাবিত্রী দেবী। (বাহিরে পদশব্দ শুনিয়া) হ্যাঁ, ঐ বোধ হয় তিনি এসেও গেলেন!

নেপথ্যে দারোয়ান ॥ হুজুর, ও আদমি আয়া।

রূপলাল ॥ ভেজ্ দেও।

(একটি রুগ্ন লোক, ততোধিক একটি রুগ্ন শিশু সন্তান সহ কক্ষে আসিয়া দাঁড়াইল। ভীত, সন্ত্রস্ত তাহাদের দৃষ্টি।)

চিন্ময়ী ॥ এটা তোমার সাজানো ব্যাপার রূপলাল। এ চক্রান্তে আমি ভুলব না। (সাবিত্রীকে) এ লোকটিকে তুমি চেনো সাবিত্রী? (কঠোর কণ্ঠে) না না, চুপ করে থেকো না—উত্তর দাও।

(এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল। সাবিত্রী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে রুগ্ন শিশুটি 'মা মা' বলিয়া সাবিত্রীকে আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। সাবিত্রী তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া নীরবে কাঁদতে লাগিল।)

চিন্ময়ী ॥ বুঝলাম। ও তোমার ছেলে। কিন্তু ও লোকটি?

(সাবিত্রী নীরবে কাঁদিতেই লাগিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না।)

শিশু ॥ (লোকটিকে) বাবা, মা কাঁদছে কেন?

চিন্ময়ী ॥ (বিস্ময়ে) সাবিত্রী! তবে তুমি কি—

সাবিত্রী ॥ না মা। আমি বিধবা নই। যাতে বিধবা না হই, রুগ্ন বেকার স্বামীকে দু বেলা দু'মুঠো খেতে দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, কোলের এই শিশুটিকে চিকিৎসা করে আরও কিছুদিন

যাতে ধরে রাখতে পারি, তাই—তাই আমার এই সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলে বিধবা-সাজে আপনার পায়ে এসে পড়েছিলাম মা।

(ক্ষণিক নিঃস্তব্ধতা।)

চিন্ময়ী॥ যত মিথ্যাই তুমি বলো, তোমার সাবিত্রী নাম মিথ্যা হয়নি মা। আজ থেকে তোমরা সবাই আমার কাছে থাকছো— (রূপলালকে) কিন্তু তোমাকে যেতে হবে রূপলাল।

(রূপলাল মাথা হেঁট করিল।)

রূপলাল॥ এর পর আমার আর থাকা চলে না জানি। যাচ্ছি। (সাবিত্রীকে) বড়ই অপরাধী মনে হচ্ছে তোমার কাছে। আমাকে পারতো ক্ষমা কর সাবিত্রী।

চিন্ময়ী॥ ক্ষমা যখন নিজ থেকেই চেয়েছে, পাপমুক্ত হয়েছ তুমি। যাও, ঘরে যাও—কাজগুলো সেরে ফেল।

(কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চিন্ময়ী ও সাবিত্রীকে তাকাইয়া দেখিয়া চলিয়া গেল।)

চিন্ময়ী॥ কিন্তু সাবিত্রী, তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না— যতক্ষণ না সিঁথিতে সিঁদুর পরছ তুমি—

(সাবিত্রী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। চিন্ময়ীকে প্রণাম করিয়া ছেলেটিকে বুকে নিয়া চলিয়া গেল।)

চিন্ময়ী॥ (লোকটিকে) তুমি বসো বাবা।

লোকটি॥ আমি সবটা বুঝতে না পারলেও এটা বুঝেছি আপনার দয়ার শরীর। আপনি মা-জননী।

(চিন্ময়ীকে প্রণাম করিতে গেল।)

চিন্ময়ী॥ আহা-থাক্ বাবা থাক।

॥ মন্দিরা ॥
পূজা সংখ্যাঃ ১৩৬৪

———

সাবধান

[বিপত্নীক এবং নিসন্তান পৌঢ় ধনী ব্যবসায়ী পুণ্যবান চৌধুরী সম্ভ বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী শিক্ষিতা তরুণী পূর্ণিমা দেবীকে। পূর্ণিমা দেবী একটি মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে—রূপের জোরেই বিনাপণে ও বিনা যৌতুকে এই ধনী গৃহের গৃহিণী হইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। পিত্রালয় হইতে পূর্ণিমার সঙ্গে পোষা একটি ময়না ছাড়া আর কিছুই আসে নাই। সেই ময়নাটি এই সুখের সংসারে যে বিপত্তির সৃষ্টি করিল এই একাঙ্কিকাটি তাহারই কাহিনী। সন্ধ্যারাত্রি। পুণ্যবান চৌধুরীর উপবেশন কক্ষ। পুণ্যবানের দুই বন্ধু, তারেশ তলাপাত্র এবং সাধুচরণ সমাদ্দার পুণ্যবানের সহিত চা-পানে রত। পূর্ণিমা চা ঢালিয়া দিতেছেন।]

তলাপাত্র ॥ (পূর্ণিমাকে) বন্ধু পুণ্যবানের অনেক পুণ্য। সেই পুণ্যে এই সংসারে উদয় হয়েছেন আপনি—পূর্ণিমার চাঁদের মতো।

পূর্ণিমা ॥ বড় বেশী বলছেন আপনি শ্রীযুক্ত তলাপাত্র।

সমাদ্দার ॥ না, না, পূর্ণিমা দেবী। তলাপাত্র এতটুকু বাড়িয়ে বলে নি। পুণ্যবানের স্ত্রী মারা যেতে এ সংসারটা একেবারে আঁধার হয়ে গিয়েছিল কিনা, তুমিই বলনা পুণ্যবান।

পুণ্যবান ॥ সেই অমাবস্যা দূর করতেই তো খুঁজে খুঁজে ধরে এনেছি তোমাদের পূর্ণিমা দেবীকে। ওকে পেলাম বলেই বেঁচে গেলাম মনে হচ্ছে। সংসারে যদি মনের মত স্ত্রী না থাকে, না থাকে দু'একটা সন্তান—কেন খাটব, কেন করব রোজগার। গেরুয়া পরে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব কিনা—এসব কথাও মনে আসছিল।

তলাপত্র ॥ আর আজ?

(সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।)

পূর্ণিমা ॥ নাঃ দেখছি আমাকে পালাতে হবে।

পুণ্যবান ॥ তা'তে আপত্তি নেই। এদের সঙ্গে একটু জরুরী কথা সেরেই সিনেমায় যাবো। তুমি গিয়ে তৈরি হও।

পূর্ণিমা ॥ (বন্ধুদের প্রতি) আচ্ছা আসি। নমস্কার।

বন্ধুদ্বয় ॥ নমস্কার! নমস্কার!

তলাপাত্র ॥ চায়ের জন্য ধন্যবাদ।

সমাদ্দার ॥ ধন্যবাদ শুধু শুরু হল, পূর্ণিমা দেবী। এমন চায়ের লোভে রোজ যদি আসি, সেটা কি খুব দোষের হবে?

পূর্ণিমা ॥ (হাসিয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া) পুণ্যবান লোকেরা হয়ত বলবেন, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। (বন্ধুদের প্রতি চাহিয়া হাসিতে হাসিতে) আমি অবশ্য তা' বলব না। আসবেন।

(নমস্কারান্তে প্রস্থান।)

সমাদ্দার ॥ ওরে বাবা, কথায় দেখছি বেশ ধার আছে।

পুণ্যবান ॥ বি-এ পাশ মেয়ে।

তলাপাত্র ॥ (পুণ্যবানকে) তোমার তো বড় বিপদ। ইংরেজীতে কথা বলা তোমার এখন ছেড়ে দিতে না হয়!

পুণ্যবান ॥ বাংলার ভুলও ধরা পড়ছে। সেদিন একটা চিঠি লিখেছিলাম, কম করে দশটা বানান ভুল ধরে দিল হে! তা' আমার ভালোই লাগছে। আমি যেন ওর ছাত্র—এমনি ওর শাসন। বেশ মজা লাগে আমার।

তলাপাত্র ॥ নাঃ, তোমার পছন্দের তারিফ করি।

সমাদ্দার ॥ বিনা পণে, বিনা যৌতুকে গরীবের ঘরের মেয়ে বিয়ে করে বাজারে যে সুনামটা কিনেছ, সেটা দেখছি সার্থকও হয়েছে।

পুণ্যবান ॥ নাও ভাই, এখন কাজের কথা হোক। এদিকে সিনেমা যাবার সময় হয়ে আসছে।

তলাপাত্র ॥ ঐ টিম্বার সাপ্লাইটা। বড়বাবুর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা পাকা করে এসেছি। দশ আনা কাঠ দেব, ষোল আনা বিল করব। এ লাভের চার আনা আমাদের, দু'আনা বড়বাবুর।

সমাদ্দার ॥ মাল ডেলিভারির তারিখ ঠিক হয়েছে এই মাসের বিশ তারিখ।

পুণ্যবান ॥ তবে তো মেরে দিয়েছ হে। Good, very good. ঐ চার আনাতেই আমাদের হাজার চল্লিশেক টাকা ঘরে আসবে, কি বল হে?

বন্ধুদ্বয় ॥ নিশ্চয়! নিশ্চয়!

তলাপাত্র ॥ (টেণ্ডারের কাগজ পুণ্যবানের সম্মুখে ধরিয়া) টেণ্ডারটা আমি লিখে-পড়ে এনেছি। তাহলে এসো, এবার আমরা দুর্গা দুর্গা বলে তিন পার্টনার সই করে দি!

(পুণ্যবান সইয়ের জন্য কাগজটি টানিয়া লইলেন। সই করিবেন—এমন সময় কক্ষের বারান্দায় খাঁচায় রক্ষিত, একটি পোষা ময়না পাখী ডাকিয়া উঠিল—**'এই চোর সাবধান'।** তিন বন্ধুই ইহাতে চমকাইয়া উঠিলেন।)

তলাপাত্র ॥ একি!

সমাদ্দার ॥ কে?

পুণ্যবান ॥ নুইসেন্স! ও কিছু না—আমি সই করছি।

(সই করিতে যাইবেন এমন সময় আবার পাখীটি চীৎকার করিয়া উঠিল—**'এই চোর সাবধান'।** অন্য দুই বন্ধু পুনরায় চমকিয়া উঠিলেন।)

পুণ্যবান ॥ আঃ!

(বিরক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তথাপি সই করিলেন।)

তলাপাত্র ॥ 'এই চোর সাবধান'!—মানে?

সমাদ্দার ॥ কে বলছে?

পুণ্যবান ॥ একটা পোষা ময়না। একটা নুইসেন্স! নাও, নাও—আমি সই করেছি, তোমরা সই কর।

তলাপাত্র ॥ দাঁড়াও, দাঁড়াও। বাধা পড়ল।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ, ব্যাপারটা কি, ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা চুরি করতেই যাচ্ছি। যদি কোন মানুষ বলতো, সাবধান, ধরতাম না। কিন্তু একটা পাখী—ঠিক সই করার সময় সাবধান হতে বলছে। আমার ভাই, মনটা কেন যেন সরছে না। হাতে দড়ি পড়বে না তো?

তলাপাত্র ॥ পাখীটা কার? কোত্থেকে এলো—'এই চোর সাবধান', মুখে এই বুলিটি নিয়ে তোমার মত পুণ্যবানের ঘরে?

পুণ্যবান ॥ আর বলো কেন! আমার বিয়েতে এই একটি মাত্র যৌতুকই এসেছে। পাখীটা ছিল পূর্ণিমার বাবার। পুষেছিল পূর্ণিমা।

সমাদ্দার ॥ আরে, পাখী তো কত লোকেই পোষে, সে সব পাখী পড়ে রাধা-কৃষ্ণের নাম—ধর্মের কথা—ভালো ভালো কথা।

তলাপাত্র ॥ কিন্তু এ পাখীর একি সর্বনেশে বুলি! কেনবা এই বুলিটাই শেখানো হল ঐ পাখীটাকে ?

পুণ্যবান ॥ পূর্ণিমাকে আমিও ঠিক এই কথাটাই জিজ্ঞেস করেছি।

সমাদ্দার ॥ কি উত্তর পেলে ?

পুণ্যবান ॥ ওদের পাড়ায় এক সময় খুব চুরি হতে থাকে। ওদের বাড়িতেও হয়। বুদ্ধিমান বাপ বুদ্ধি করে ময়নাটা কেনেন। পূর্ণিমার ওপর ভার দেন ময়নাটাকে এই বুলি শেখাবার।

তলাপাত্র ॥ তা' দেখছি পূর্ণিমা দেবী ভাল মাষ্টারণী।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ। আমাদের পিলে চমকে গেছে।

তলাপাত্র ॥ তারপর আর বোধ হয় তোমার শ্বশুর-বাড়িতে চুরি হয়নি ?

পুণ্যবান ॥ না। পূর্ণিমার এইটাই হয়েছে মস্ত এক গর্ব। পাখীটা সারারাত জেগে থেকে চোরদের সাবধান করে।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ, তা' করে বটে। অন্ততঃ আমি এ টেণ্ডারে সই করব না। কুসংস্কার বলতে হয় বল, কিন্তু এটা কি ঠিক নয়, এমনি সব শুভ কাজে আমরা যখন যাই, তখন হাঁচি-টিকটিকিও মেনে থাকি, আর এ তো শুনলাম যেন একটা দৈববাণী।

তলাপাত্র ॥ আমারও তাই মনে হচ্ছে ভাই।

পুণ্যবান ॥ এত বড় একটা দাঁও—সামান্য একটা কারণে ছেড়ে দেবে ? না-না, ছেলে-মানুষি করো না।

সমাদ্দার ॥ না ভাই, পারবো না। এসব আমি বড় মানি।

তলাপাত্র ॥ আমিও। দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে, তার ওপর আমার এখন আবার শনির দশা চলছে। আচ্ছা, আজ উঠি।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ। আজ উঠি। আমার গুরুদেব বলেছেন, কোন কাজের আগে মনটাকে নেড়ে-চেড়ে দেখবি। যদি আলো দেখতে পাস—এগিয়ে যাবি—আঁধার দেখলে কেটে পড়বি।

তলাপাত্র ॥ হ্যা। কেটেই পড়ছি আমরা আজ। ব্যবসা যদি চালাতে চাও, আগে ময়নাটি উড়িয়ে দাও—

সমাদ্দার ॥ তুমি বলছো উড়িয়ে দাও, আমি বলি ওর ঘাড় মটকে ভবলীলা সাঙ্গ করে দাও। ওসব অযাত্রা নিজের বাড়িতে রাখতে নেই, পরের বাড়ীতেও দিতে নেই।

পুণ্যবান ॥ পরের কথা ভাবছিনে, নিজের কথাই ভাবছি। (হঠাৎ) আমি ভাই পাখীটাকে এখনি উঠিড়ে দিচ্ছি—পূর্ণিমা আসবার আগে।

তলাপাত্র ॥ তারপর ?

পুণ্যবান ॥ চাকর-বাকরদের ওপর একচোট রাগা-রাগি করব আমি—"খাঁচার দরজাটা নিশ্চয় আলগা রেখেছিলি, তাই পাখীটা উড়ে গেল"—সে আমি ম্যানেজ করব'খন, তোমরা ভেব না। তোমরা বস। পাখীটা তাড়িয়ে দিয়ে আমিও এসে বসছি। সইটা ভাই আজই করা দরকার।

সমাদ্দাব ॥ সে ভাই যা' করতে হয় কর, কিন্তু সই আজ হবে না।

তলাপাত্র ॥ কিন্তু টেণ্ডারটা কাল সকাল দশটায় দাখিল করতে হবে। (ভাবিয়া) সইগুলো আজ হওয়াই উচিত। আচ্ছা ভাই আমরা আসছি—যাত্রা বদল করে আসছি।

সমাদ্দার ॥ হ্যাঁ, সে বরং মন্দের ভালো। ইতিমধ্যে পাখীটাকে কিন্তু ভাই সাবাড় কর।

(তলাপাত্র ও সমাদ্দারের প্রস্থান। পুণ্যবান ক্ষণকাল কি ভাবিলেন। তারপর হঠাৎ বারান্দায় পাখীর খাঁচার দিকে চলিয়া গেলেন। অন্যদ্বার-পথে সিনেমা যাওয়ার সাজে সজ্জিতা পূর্ণিমা দেবীর প্রবেশ।)

পূর্ণিমা ॥ (কাহাকেও না দেখিয়া) কই ! কোথায় !

(পুণ্যবানের প্রবেশ)

পুণ্যবান ॥ এই যে পূর্ণিমা !...ব্যাপার কি বলতো ? তোমার ময়নাটা খাঁচাতে নেই।

পূর্ণিমা ॥ নেই ! সেকি !!

(ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া শূন্য খাঁচা দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন।)

পূর্ণিমা ॥ সত্যি তো, নেই ! রামু নিশ্চয়ই খাবার দিতে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল—

পুণ্যবান ॥ রামুকে এখনি আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

পূর্ণিমা ॥ না না, সে কি ! অতদিনের পুরোনো চাকর, সামান্য একটা ভুলের জন্য—না না, থাক।

পুণ্যবান ॥ থাকবে কি ! তোমার অত আদরের পোষা পাখী—

পূর্ণিমা ॥ রামু চাকরটিও তোমার কম আদরের নয়। বরং ময়নাটা গেছে ভালোই হয়েছে। কষ্ট যে না হচ্ছে তা নয়, তবে এ সংসারে ওর ঐ বুলিটা বড় বেমানান মনে হচ্ছিল। এখানে চোর কোথায় যে সাবধান করবে।···কি ভাবছো ? সিনেমায় যাবে না ?

পুণ্যবান ॥ ভাবছিলাম, তুমি কি নির্মম। এই ক'দিনেই পাখীটার ওপর আমারই কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল। শোন, আজ সিনেমা থাক্। ঐ তলাপাত্র আর সমাদ্দার খুব বড় একটা বিজনেসের খবর নিয়ে এখনি আবার আসবে বলে গেল।

পূর্ণিমা ॥ বেশ তো, আমি তবে মামার বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আসি।

পুণ্যবান ॥ চট্ করে এসো কিন্তু। ব্যবসার কথাবার্তা সেরে এই রাতেই তোমাকে নিয়ে যেতে চাই হগ্‌মার্কেটে। ময়না আমার একটা কিনতেই হবে তোমার জন্য ! তার বুলিটা কিন্তু বেশ ভালো হওয়া চাই। কি বুলি পড়াবে তুমি এবার ?

পূর্ণিমা ॥ (আনন্দোজ্জ্বল চোখে) 'তুমি আমার কাছে এস।'

পুণ্যবান ॥ Naughty girl !

পূর্ণিমা ॥ আচ্ছা আসি—

(হঠাৎ দরজায় শোনা গেল 'দুর্গা, দুর্গা।' সঙ্গে সঙ্গে আর একজন কে

বলিয়া উঠিল—'আসবো ?')

পুণ্যবান ॥ বন্ধুরা ফিরে এসেছেন। (তাঁহাদের উদ্দেশ্যে) এসো ভাই, এসো।

(সঙ্গে সঙ্গে তলাপাত্র ও সমাদ্দারের পুনঃপ্রবেশ)

তলাপাত্র ॥ এই যে বৌদি, নমস্কার।

সমাদ্দার ॥ নমস্কার।

পূর্ণিমা ॥ নমস্কার। আপনারা বসে আপনাদের বিজ্‌নেস করুন। আমি মামা-বাড়ী থেকে এখনি ঘুরে আসছি। আচ্ছা চলি।

(পূর্ণিমা বাহিরে চলিয়া গেলেন।)

তলাপাত্র ॥ (পুণ্যবানকে) পাখীটা ?

পুণ্যবান ॥ উড়িয়ে দিয়েছি।

সমাদ্দার ॥ যাক, বাঁচা গেল। পথ দিয়ে এখনি একটা মড়া নিয়ে যেতে দেখলাম। এবারকার যাত্রাটা মনে হচ্ছে শুভ।

তলাপাত্র ॥ হ্যাঁ। চটপট আগে সইগুলো সেরে ফেলা যাক।

পুণ্যবান ॥ (সঙ্গে সঙ্গে টেণ্ডারের কাগজগুলি তাহাদের সামনে রাখিলেন)

তলাপাত্র ॥ ব্রহ্মময়ী তারা। রাজা কর বাবা।

(সই করিতে গেলেন)

সমাদ্দার ॥ খুব কম করেও চল্লিশ হাজার টাকার দাঁও—জয়মা কালী। পাঁঠা দেব মা।

(এমন সময় ময়না পাখীটি ডাকিয়া উঠিল—'**এই চোর সাবধান**'। সকলে চমকাইয়া উঠিলেন। তলাপাত্র সই না করিয়া পরম বিরক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সমাদ্দারও। পুণ্যবান ক্ষেপিয়া গেলেন। দেরাজ টানিয়া রিভলবারটি বাহির করিলেন।)

তলাপাত্র ॥ (পুণ্যবানকে) তুমি না পাখীটা উড়িয়ে দিয়েছিলে ?

সমাদ্দার ॥ ছিঃ ছিঃ! শুভ কাজে একি অযাত্রা!

(ইতিমধ্যে পুণ্যবান রিভলবার লইয়া খাঁচার দিকে ছুটিয়া গিয়াছেন। এমন সময় পূর্ণিমা দেবীর পুনঃপ্রবেশ।)

পূর্ণিমা ॥ বাইরে গিয়েই দেখলাম, ময়নাটা উড়তে উড়তে আবার ফিরে এলো।

(তিনি ছুটিয়া খাঁচার দিকে যাইতেছিলেন, এমন সময় রিভলবারের আওয়াজ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমা আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন।)

পূর্ণিমা ॥ য়্যাঁ! একি!

(রিভলবার হস্তে পুণ্যবানের প্রবেশ।)

পূর্ণিমা ॥ (পুণ্যবানকে) একি, তুমি! কাকে গুলি করলে?

(দেখিবার জন্য ছুটিয়া বারান্দায় গেলেন। তিন বন্ধুর মুখে আর কোন কথা সরিল না। পূর্ণিমা পুনরায় ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।)

পূর্ণিমা ॥ আমার ময়নাটা ফিরে এসেছিল—তুমি তাকে গুলি করে মারলে?

(পুণ্যবানের মুখে কোনো কথা সরিল না। অন্য দুই বন্ধুও নীরব রহিলেন।)

পূর্ণিমা ॥ আমার বাপের বাড়ীতে ওটা যখন ছিল, তখন একটা চোর চুরি করতে এসে ওর ঐ বুলিতে চমকে ওঠে। পালাবার সময় চোরটা ওকে ঘাড় মটকে মারবার চেষ্টা করেছিল। ততক্ষণে আমরা জেগে উঠে ছুটে আসায় পাখীটা বেঁচে গিয়েছিল। সে ছিল চোর। কিন্তু তুমি? তুমি কেন পাখীটাকে গুলি করে মারলে?

পুণ্যবান ॥ আজ আমার কাছে এর কোন উত্তর তুমি পাবেনা পূর্ণিমা।

সমাদ্দার ॥ পাবেন। উত্তর একদিন পাবেন।

তলাপাত্র ॥ সেদিন বুঝবেন, ব্যাপারটা বড়ই মর্মান্তিক।

সমাদ্দার ॥ আজ শুধু এইটুকু বলা যায় পূর্ণিমা দেবী, পুণ্যবানও চুরি করেছে—মন চুরি।

তলাপাত্র ॥ (হাসিয়া) হেঃ হেঃ হেঃ—আপনার।

(সঙ্গে সঙ্গে টেণ্ডারের কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।)

পূর্ণিমা ॥ আপনারা যে কি—আমি বুঝলাম না।

(বলিয়াই গম্ভীর ভাবে অন্দরে চলিয়া গেলেন। তিনবন্ধু পরস্পরের দিকে চাহিয়া মাথা হেঁট করিলেন।)

যবনিকা।

॥ ভারতবর্ষ ॥
কার্তিক : ১৩৬৫

যমালয়ে এক বেলা

[যমপুরী ॥ বিচার-ভবন। সিংহাসনে যমরাজ অধিষ্ঠিত। তাঁহার দক্ষিণে নিম্ন আসনে যমরাজের খাস মুন্সী চিত্রগুপ্ত। দপ্তরে কতিপয় কর্মচারী খাতাপত্র পরীক্ষারত। যমালয়ে সদ্য আগত মনুষ্যবৃন্দের বিচার হইতেছে। কাঠগড়ায় আসামী দণ্ডায়মান। দণ্ডধারিগণ যথাস্থানে কর্তব্যরত।]

চিত্রগুপ্ত ॥ তোমার নাম সাধুচরণ দাস ?

আসামী ॥ হ্যাঁ হুজুর।

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মাবতার! বিবেচনা করুন, নাম ছিল সাধুচরণ, কিন্তু এমন অসাধু কাজ ছিল না,—যা জীবদ্দশায় এ আসামী করেনি।

সাধুচরণ ॥ দোহাই যমরাজ দোহাই ধর্মাবতার! যা করেছি,—পেটের দায়ে (হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

যমরাজ ॥ থামো। সাধুচরণ—অথচ অসাধু! পিতৃদত্ত নামের এমন অমর্যাদা! চিত্রগুপ্ত, আসামীর খতিয়ান—

(জনৈক কর্মচারী আসামীর খতিয়ান খাতা আগাইয়া দিল)

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা পরীক্ষা করিয়া) অন্নপ্রাশনে পিতৃদত্ত নাম দেখা যাচ্ছে, হাবুলচন্দ্র। স্কুলে হাবুল হয় হরিবল্লভ। স্কুলে একটিমাত্র বিদ্যাই শেখে। তা হচ্ছে—চুরি-বিদ্যা। প্রথম অপরাধ পাচ্ছি,—পণ্ডিতের টিকি-কাটা।

সাধুচরণ ॥ না পড়িয়ে খালি ঘুমোতেন হুজুর।

যমরাজ ॥ তুমি থামো। (চিত্রগুপ্তের প্রতি) তারপর ?

চিত্রগুপ্ত ॥ ঐ টিকি-কাটা থেকেই শুরু হয় পকেট কাটা। তা থেকে হয় জেল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে হরিবল্লভ হয়ে গেল প্রাণকেষ্ট। তারপর নামের ছড়াছড়ি—মানে, এক একবার জেল—খালাস পেয়েই নাম-বদল। হাবুল—ওরফে হরিবল্লভ ওরফে প্রাণকেষ্ট ওরফে হবিবুল্যা—ওরফে পিটার গোমেস—ওরফে সাধুচরণ।

যমরাজ ॥ লোকটা দেখছি বহুরূপী।

সাধুচরণ ॥ পেটের দায়ে হুজুর,—পেটের দায়ে। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে—এই দুর্দিনে—(হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

যমরাজ ॥ এই—থামো। সারাজীবন লোককে ঠকিয়ে এখন কাঁদলে চলবে কেন? কতো লোককে তুমি কাঁদিয়েছো—তা' খবর রাখো? (চিত্রগুপ্তের প্রতি) চিত্রগুপ্ত! আসামীর দ্বারা প্রবঞ্চিত লোকের সংখ্যা?

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা পরীক্ষা করিয়া) তিন হাজার সাত শত বাহান্ন। লোকটার বিশেষত্ব এই,—সারা জীবন শুধু পকেটই কেটেছে—মানে, পকেট কাটার মহারাজ। চিত্তাকর্ষক একটা ঘটনাও দেখছি,—নিজের শ্বশুরেরও পকেট কেটেছে।

যমরাজ ॥ বটে!

চিত্রগুপ্ত ॥ শুধু তাই নয় প্রভু, শেষে নিজের ছেলেটাকেও পকেটমারা বিদ্যে শিখিয়েছে।

যমরাজ ॥ অর্থাৎ—অসাধুতার চরম। চরম দণ্ডই তবে হোক্।

(আসামী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল)

সাধুচরণ ॥ রক্ষে করুন—দয়া করুন—দোহাই ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ জীবদ্দশায় চরম অসাধুতা করে—

চিত্রগুপ্ত ॥ হুজুর—ধর্মাবতার,—সাধুতাও এর দেখতে পাচ্ছি।

যমরাজ ॥ বটে!

চিত্রগুপ্ত। হ্যাঁ ধর্মাবতার। আপনি সর্বজ্ঞ—আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পকেটমারদেরও একটা সমিতি আছে আর নির্দিষ্ট ঘাঁটি, মানে, এলাকা আছে। নিয়মটা হচ্ছে এই—রামের এলাকায় শ্যাম যাবে না। অনেক সময় পকেটমারদের মধ্যে কেউ কেউ অসুখে-বিসুখে ভোগে, কি ধরুন জেলেই গেল—তখন তার সংসার প্রতিপালনের ভার এই সমিতির আর আর সাথীরা নেয়। ধরুন, কাবুলের হলো অসুখ,—তখন হাবুল যাবে কাবুলের ঘাঁটিতে। গিয়ে সেখানে যা' রোজগার করবে, তা' তিন ভাগ হবে। হাবুল নেবে

এক ভাগ, আর কাবুলকে দেবে দু'ভাগ। দেখা যাচ্ছে, আমাদের এই সাধুচরণ সঙ্গীদের এমনি সব বিপদে একটিবারও অসাধুতা করেনি। কোন সাক্ষী থাকে না, কিন্তু তবু কড়ায় গণ্ডায় সঙ্গীদের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছে।

যমরাজ ॥ হুঁ, তাহলে দেখছি—এক জায়গায় তুমি সত্যি সত্যিই সাধু ছিলে—অন্ততঃ নিজেদের মধ্যে। আজকাল এ-ও খুব বিরল। খুসী হলাম চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ হুজুর—ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ আমি এর দণ্ডের কথা ভাবছি।

সাধুচরণ ॥ (হাউ মাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) দয়া করুন হুজুর।

যমরাজ ॥ না, না, নরকভোগ তোমাকে করতেই হবে। তবে ঐ সাধুতাটুকু তোমার ছিল বলে, নিকৃষ্ট তৃতীয় শ্রেণীর পরিবর্তে তোমাকে উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হবে।

সাধুচরণ ॥ জয় ধর্মরাজ—জয় ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ (দণ্ডধারিগণের প্রতি) নিয়ে যাও। পরের আসামী।

[জনৈক দণ্ডধারী সাধুচরণকে লইয়া গেল। অন্য একজন দণ্ডধারী জনৈকা মহিলা আসামীকে আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।]

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা দেখিয়া) তোমার নাম—কামিনী দেবী।

মহিলা ॥ কামিনী নয়,—সে নাম ছিল শিশুকালে। পরে আমার নাম হয়—কামনা দেবী।

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা পরীক্ষা করিয়া) হ্যাঁ, এই যে - তাও রয়েছে। (যমরাজকে) ধর্মাবতার, কামনা নামটা এর মিথ্যা হয়নি। কামনার আগুনে নিজে সারা জীবন পুড়েছে, অপরকে পুড়িয়েছে। শেষটায় আত্মহত্যা করেছে। আশা ছিল, সব জ্বালা তাতে জুড়োবে।

কামনা ॥ কই জুড়োলো? আরো বেড়ে গেছে। দোহাই ধর্মরাজ! তোমার পায়ে পড়ি। আমার স্মৃতিশক্তিটা তুমি ধ্বংস কর।

যমরাজ ॥ (চিত্রগুপ্তকে) অভিনেত্রী ছিল বোধহয়?

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মরাজের অনুমান মিথ্যা নয়। শুধু রঙ্গমঞ্চে নয়, সংসার

রঙ্গমঞ্চেও এর পেশাই ছিল অভিনয়। অভিনয় ক'রে বহুলোককে কামনার আগুনে করেছে দগ্ধ।

যমরাজ ॥ সংখ্যা ?

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা দেখিয়া) রঙ্গমঞ্চের প্রেক্ষাগারে লালসা-দগ্ধ লক্ষ লক্ষ দর্শকের হিসাব দিয়ে আমি ধর্মাবতারের ধৈর্যচ্যুতি করতে চাই না। এক সংসার-রঙ্গমঞ্চেই এই নারীর কামনার আগুনে দগ্ধ হয়েছে—সতেরো হাজার নয় শত সাড়ে তিরাশি জন।

যমরাজ ॥ সাড়ে তিরাশি জন মানে ?

চিত্রগুপ্ত ॥ আজ্ঞে, স্কুল কলেজের তরুণদের অর্ধেক বলেই গণনা করা হয়।

যমরাজ ॥ ও, হ্যাঁ, কিন্তু আত্মহত্যা করলো কেন ?

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রেমার্তা হয়ে ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ কিরূপ ?

কামনা ॥ আমাকে বলতে দিন ধর্মাবতার—আমাকে বলতে দিন। বলতে পারলে—আমার এই দুঃসহ জ্বালা হয়তো কিছুটা জুড়োবে।

যমরাজ ॥ বেশ ! বেশ।

কামনা ॥ আমার যখন বারো বৎসর বয়স—জীবনের অথবা যৌবনের যখন কোন খবরই আমার কাছে পৌঁছেনি, তখন আমার পিতা-মাতা ধনলোভে অন্ধ হ'য়ে আমার বিবাহ দেন—এক ধনকুবের বৃদ্ধের সঙ্গে।

যমরাজ ॥ সত্য চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত ॥ সত্য ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ (চিত্রগুপ্তের প্রতি) অসত্য বললেই তুমি তা' ঘোষণা করবে। (কামনাকে) বল।

কামনা ॥ যৌবনে পদার্পণ করার আগেই হলাম আমি বিধবা। আমার জাগ্রত যৌবনে প্রেমের পরশ আমি পেলাম না ধর্মরাজ। নিষ্ঠা আর নিষেধের গণ্ডিতে দেখলাম আমিই শুধু বন্দিনী। কিন্তু চারদিকেই আমার কামনার সমারোহ। অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হয়ে

মুক্তির সন্ধানে এক সাধুর শরণাপন্ন হলাম। সংসার-আশ্রম থেকে আমাকে টেনে নিয়ে গেলেন তিনি তাঁর সন্ন্যাস আশ্রমে। ধর্মের নামে কি ব্যভিচার চলে—তা দেখলাম আমি সেখানে। দেখলাম, সন্ন্যাসী নয়—পশু।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ মিথ্যা নয় প্রভু।

কামনা ॥ সন্ন্যাসীর আবরণে পশু। পুরুষ জাতটার ওপরই দাঁড়িয়ে গেল আমার ঘৃণা। পুরুষ কাউকে দেখলেই মনে হতো মূর্তিমান ছলনা। আমিও ক্ষেপে উঠলাম—'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ'। আর এমনি করেই শুরু হলো আমারও ছলনার অভিযান।

যমরাজ ॥ তার অর্থ?

চিত্রগুপ্ত ॥ তার অর্থ—বেশ্যাবৃত্তি ধর্মরাজ। প্রেমের অভিনয়ে এমন দক্ষ হলো যে, রঙ্গমঞ্চে সাড়া পড়ে গেল।

কামনা ॥ হ্যাঁ ধর্মরাজ। রঙ্গমঞ্চেরও সেরা অভিনেত্রীর সম্মান আমি পেলাম। কিন্তু এই অভিনয়ই হলো আমার কাল। জীবনে কোনো পুরুষকেই আমি ভালবাসতে পারিনি—ভালবাসিনি। প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিলো। হঠাৎ একদিন আমি আবিষ্কার করলাম, আমি ভালবেসে ফেলেছি—যে নাটকে আমি নায়িকার অভিনয় তখন করছিলাম, সেই নাটকেরই নায়ককে। প্রেমার্তা আমি—নিবেদন করলাম তাকে আমার প্রেম। সে তা' বিশ্বাস করলো না। স্পষ্ট বললো,—সেও নাকি আমার অভিনয়। আমারি চোখের সামনে সে ভালবাসলো থিয়েটারের নগণ্যা এক সখীকে। সইতে পারলাম না ধর্মরাজ,—এ পরাজয় আমি সইতে পারলাম না। নাটকে আমার ভূমিকাতে ছিল বিষপানে মৃত্যু-বরণ। একদিন সেই অভিনয়কেই আমি সত্য করলাম—সত্যিকার বিষপানে।

যমরাজ ॥ বল কী? মরতে গিয়েও তুমি দর্শকদের ছলনা করেছো? নরক-বাস তোমার অনিবার্য। (দণ্ডধারীদের প্রতি) যাও নিয়ে যাও।

কামনা ॥ (উন্মত্তবৎ চিৎকার করিয়া) তাতে আমার দুঃখ নেই—আমি যাচ্ছি, কিন্তু দোহাই ধর্মরাজ, আমার স্মৃতিশক্তিটা ধ্বংস করে দাও—আমার স্মৃতিশক্তিটা ধ্বংস করে দাও।

(জনৈক দণ্ডধারী তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল)

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত !

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রভু।

যমরাজ ॥ পৃথিবীটার কি হ'ল !

চিত্রগুপ্ত ॥ সভ্যতা আর সংস্কৃতির পথে নাকি দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। আর একটি নমুনা দেখুন।

[ইঙ্গিত মাত্র জনৈক দণ্ডধারী এক আসামীকে আনিয়া কাঠগড়ায় খাড়া করিল।]

চিত্রগুপ্ত ॥ তুমি রামহরি গড়গড়ি।

রামহরি ॥ হ্যাঁ, হুজুর। দণ্ডবৎ হই হুজুর।

[আভূমি নত হইয়া প্রণামের চেষ্টা]

চিত্রগুপ্ত ॥ থাক্—থাক্।...তেল-ঘির ব্যবসা ?

রামহরি ॥ ব্যবসাও বটে, আবার ব্যবসা নাও বটে। মানে, ডান হাতে আনা—বাঁ হাতে ছাড়া—এই যা। কোনোরকমে পেটের ভাত হচ্ছিল হুজুব। তা' এরি মধ্যে সমনজারী হলো। কিছুই গুছিয়ে রেখে আসতে পারিনি হুজুর।

চিত্রগুপ্ত ॥ (যমরাজকে) তেল-ঘি গুদামজাত করে—তাতে ভেজাল মিশিয়ে ঠাকুর-দেবতার নামে মার্কা করে—বাজারে ছাড়া ছিল এর ব্যবসা। আর এই ব্যবসা করে লোকটা হয়েছিল কোটিপতি। আবার বলছে কিনা,—কোন রকমে পেটের ভাত হচ্ছিল।

রামহরি ॥ টাকার কথা বলবেন না হুজুর,—এক হাতে এসেছে, আর একহাতে গেছে। খবরের কাগজগুলো সঙ্গে আনতে পারিনি হুজুর, নৈলে দেখিয়ে দিতাম—এমন দিন খুব কমই গেছে, যেদিন প্রথম পাতায় আমার দান-ধ্যানের খবর—আমার ছবি ছাপা হয়নি।

যমরাজ ॥ একথা সত্য চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত ॥ তা সত্য ধর্মরাজ। কিন্তু এটা আরো মারাত্মক এইজন্য যে, এই সব দান-ধ্যানের ঢাক পিটিয়ে—ধর্মের মুখোস পরে—এমনভাবে অধর্মের কাজ করে যায় যে, কেউ সন্দেহ করে না। এদের ব্যবসার এটা একটা ফিকির! ভেজাল খাইয়ে গোটা দেশটাকেই এরা উচ্ছন্নে দিচ্ছে ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ কী হে?

রামহরি ॥ আজ্ঞে, আপনারা স্বর্গের দেবতা—মাটির মানুষকে চেনেন না হুজুর। লোক বুঝেই খাত্য। দেশে আজ খাঁটি লোক কোথায় যে খাঁটি খাবার রুচবে? এতোকাল ভেজাল খেয়ে খেয়ে খাঁটি জিনিস লোকের আর হজমও হয় না। ভেজালটাই আজ সয়ে গেছে—খাঁটি আর সইছে না।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রভু।

যমরাজ ॥ কথাটা খাঁটি কিনা, তদন্ত করে দেখবে।

চিত্রগুপ্ত ॥ তা, না হয় দেখবো ধর্মাবতার। কিন্তু তাই বলে এর দোষ-স্খালন হচ্ছে না। খাঁটির দাম আদায় করে ভেজাল চালানো—এ একটা সাংঘাতিক পাপ। সারাজীবন লোককে ঠকিয়েছে—দান-ধ্যান করে আরো বেশী ঠকিয়েছে—আর, চরম ঠকিয়েছে মরতে বসে।

যমরাজ ॥ বলো কীহে চিত্রগুপ্ত?

মরতে বসেও লোককে ঠকিয়েছে?

রামহরি ॥ না হুজুর। বব, আমি বলবো, আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে—তবেই হুজুরের কাছে এসেছি। ব্যবসার ক্ষেত্র থেকে যখন সরেই এসেছি, মন খুলেই বলছি হুজুর। যখন বুঝলাম, আর বাঁচবো না—একশো আট টাকা ফিয়ের ডাক্তারও যখন মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল, তখন হুজুর, কেন যেন মনে একটু অনুতাপই এলো। ভেবে দেখলাম সারাজীবন লোককে ঠকালাম,—শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার আগে কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করে

যাই,—নইলে কোন্ মুখে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবো! কী কৈফিয়ৎই বা দেবো!

যমরাজ ॥ বটে!

রামহরি ॥ হ্যাঁ ধর্মাবতার। খাবি খাচ্ছি শুনে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সব শেষ দেখা করতে এলো। প্রাণ খুলে তাদের বললাম—"আর কী দেখছো হে—চললাম। সারাজীবন মানুষকে ঠকিয়েছি। কী ঠকিয়েছি—কেমন করে ঠকিয়েছি, তা হয়তো তোমরা জান না। কিন্তু আমি জানি, আমি ঠকিয়েছি। এখন বুঝছি, নিজেই ঠকেছি। যদি তোমরা আমার আপন জন হও—যদি তোমরা আমার সদ্গতি চাও, আমার শেষ অনুরোধটি রাখো।"

যমরাজ ॥ বটে! কী অনুরোধ?

রামহরি ॥ জীবের কল্যাণে আমার এই দেহ-দানের অনুরোধ ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ সে আবার কী হে গড়গড়ি?

রামহরি ॥ আজ্ঞে ধর্মাবতার। মরে গেলে ওরা আমাকে চন্দন কাঠে গব্য ঘৃতে পোড়াতো। কিন্তু, এই পাপ দেহের ভস্ম কারোর কোন কাজেই লাগতো না ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ বটে।

রামহরি ॥ হ্যাঁ ধর্মাবতার। তাই আমি তাদের কাছে আমার শেষ প্রার্থনা জানালাম,- "এ পাপ-দেহ তোমরা পুড়িও না গো, পুড়িও না।"

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত ॥ মিথ্যা নয় প্রভু।

যমরাজ ॥ মৃতদেহ পোড়াবে না? কেন?

রামহরি ॥ জীবের কল্যাণে ধর্মাবতার। বেঁচে থেকে কারুর কোন উপকার করিনি—মৃতদেহটায় জীবের উপকার হোক—মানুষের না হোক্, পশুপক্ষীর হোক। সেইভেবেই সকলের হাতে ধরে এই অনুরোধই জানিয়ে আমি শেষ-বিদায় নিলাম—"আমি মলে এ অঙ্গ না পুড়িয়ে ভাগাড়ে দিও ফেলে—পশু পক্ষীকে নিবেদন

ক'রে। শকুনেও যদি আমায় ছিঁড়ে খায়—একটা কাজ হবে—দেহটা তবু কিছু সার্থক হবে—খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে আমার জীবনব্যাপী পাপের।" হয়নি কি তা ধর্মরাজ ?

যমরাজ। চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ আমিতো বলেছি ধর্মরাজ, মরতে বসেও সবাইকে এ লোকটা ঠকিয়ে এসেছে।

যমরাজ ॥ (বিরক্ত হইয়া) তুমি বলছো কী চিত্রগুপ্ত ? যতো পাপই লোকটা করে থাক না কেন, এই চরম অনুতাপে—জীবকল্যাণে এই পরম দানে তার কী প্রায়শ্চিত্ত হযনি বলতে চাও চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত ॥ তবে শুনুন ধর্মরাজ : (খাতা দেখিয়া) লোকটার মৃত্যু হলো। অন্তিম-মিনতি অনুযায়ী এর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এর মৃতদেহ না পুড়িয়ে ভাগাড়েই দেয় ফেলে। পুলিশ খবর পেয়ে—সম্পত্তির লোভে হত্যাকাণ্ড সন্দেহ করে। সঙ্গে সঙ্গে এর সেই শ্মশান—মানে, ভাগাড়-বন্ধুদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তারা সবাই হাজতে পচছে।

যমরাজ ॥ বলো কী হে ?

চিত্রগুপ্ত ॥ হ্যাঁ প্রভু। অতগুলো লোক যাতে ধনে-প্রাণে মারা যায়, সে ব্যবস্থা করে - তবে এ লোকটা মরেছে।

যমরাজ ॥ কী হে ?

রামহরি ॥ আমি মারা যাওয়ায় এ খবরটা আমি জানতাম না হুজুর। এই খবরটাই আমি জানবার জন্যে ছটফট করছিলাম ধর্মাবতার। ছোট হুজুরের দয়ায় খবরটা পেয়ে প্রাণটা আমার ঠাণ্ডা হলো ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ বলো কী হে ? কেন বলতো ?

রামহরি ॥ হুজুর ! ভেজাল ব্যবসা করতে গিয়ে ঝড় ঝাপটা সবই গেছে আমারি ওপর দিয়ে। ঘুসঘাস, জরিমানা—যা কিছু দিতে হয়েছে—দিতে হয়েছে আমাকেই। আর ও শালারা সব আমার টাকাতে শুধু মজাই লুটে গেছে—গায়ে কারো এতোটুকু আঁচড় লাগেনি। পাপের ফলভোগ আমি একাই করবো,—এতো আর হয় না হুজুর।

তাই, আসবার সময় আমি ওদের ঐ ব্যবস্থাই করে এসেছি। আর সে ব্যবস্থাটা যে এমন সুফল প্রসব করেছে তা' জেনে আর আমার কোনো দুঃখ নেই। হুজুর যে শাস্তি দিতে হয় দিন—আমি প্রস্তুত।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত! লোকটি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। একে কী দণ্ড দেবো, অথবা দণ্ড দেবো কিনা—খুব সূক্ষ্মভাবে আমাকে বিচার করে দেখতে হবে। এর বিচার মুলতুবি রইলো। পরবর্তী আসামী।

রামহরি ॥ জয় ধর্মরাজ -জয় ধর্মরাজ!

(দণ্ডধারী কর্তৃক অপসারিত হইল।)

॥ ভগ্নদূত ॥
পূজা সংখ্যাঃ ১৩৬১

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মরাজ!

যমরাজ ॥ ক্রমাগত অধার্মিক আসামীদের বিচার করে করে কেমন একটা অবসাদ বোধ করছি। আজকের মৃত্যুর তালিকাটা আমায় দেখতে দাও।

চিত্রগুপ্ত ॥ এই যে প্রভু—(তালিকাটি যমরাজের হস্তে দিলেন)।

যমরাজ ॥ (তালিকা পরীক্ষা করিয়া দণ্ডধারীদের প্রতি) শ্রীশ্রীস্বামী পরমানন্দ অবধূত মহারাজ—আনো।

[আদেশমাত্র জনৈক দণ্ডধারী অবধূত মহারাজকে আনিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।]

চিত্রগুপ্ত ॥ নাম—শ্রীশ্রীস্বামী পরমানন্দ অবধূত মহারাজ?

পরমানন্দ ॥ লক্ষ লক্ষ ভক্তের দ্বারা আমি ঐ নামেই অভিহিত ধর্মাবতার।

চিত্রগুপ্ত ॥ ভক্তদের কাছে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান বলে নিজেকে প্রচার করেছিলে?

পরমানন্দ ॥ আমাকে কিছুই করতে হয়নি ধর্মাবতার। ভক্তরাই ঐরূপ বিশ্বাসে আমাকে পূজো করতো।

যমরাজ ॥ তুমি তার প্রতিবাদ করেছিলে কখনো ?

পরমানন্দ ॥ না ধর্মরাজ। এটা বিশ্বাসের কথা। আর, এরূপ বিশ্বাসে বাধা দিলে তাদেব মনে ব্যথা দেওয়াই হতো। ভক্তের মনে ব্যথা দিতে আমার মন সরেনি ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ বটে! তুমি তবে ভগবান ?

পরমানন্দ ॥ আমি তো বলেছি ধর্মরাজ, আমি ভগবান কিনা,—এটা ভক্তদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে। কেউ যদি আমাকে ভগবান বিশ্বাসে পূজা করে, অন্ততঃ তার কাছে আমি ভগবানই। বিশ্বাসের এই সোজা পথে ভগবান লাভ করা—অতি সহজ।

যমরাজ ॥ এই মহাপ্রভুর ভক্তদেব কী গতি হয়েছে, চিত্রগুপ্ত ?

চিত্রগুপ্ত ॥ তা অনেকেব পরমাগতি লাভ হয়েছে ধর্মরাজ।

পরমানন্দ ॥ হতেই হবে। জানেন তো ধর্মরাজ,—"বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর!" সোজা কথা—সোজা পথ।

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মরাজ! ইনি ভগবান—এই অন্ধ বিশ্বাসে এর পূজোপকরণ যোগাতেই বহু ভক্ত সর্বস্বান্ত হয়েছে—বহু ধনী দেউলিয়া হয়ে গেছে—অনেকের স্ত্রীপুত্র পথে বসেছে।

পরমানন্দ ॥ ঈশ্বরকে যাঁরাই লাভ করতে চেয়েছেন, এখনি সব দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়েই তাঁরা তা লাভ করেছেন।

চিত্রগুপ্ত ॥ কিন্তু তাদের এই দুঃখ-দৈন্য তোমার সুখ-ঐশ্বর্যের কারণ হয়েছে। তাদের রিক্ত করে তুমি হয়েছো বিত্তশালী।

পরমানন্দ ॥ ভক্তের দান আমাকে নিতেই হবে ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত! মহাপ্রভুর আয়ের পরিমাণ ?

চিত্রগুপ্ত ॥ (খাতা পরীক্ষান্তে) আমাদের খাতায় দেখতে পাচ্ছি ধর্মাবতার দশ লক্ষ সাতাশ হাজার তিন শত পাঁচ টাকা আট আনা সতেরো গণ্ডা তিন কড়া এক ক্রান্তি। কিন্তু ওঁর আয়করের খাতায় উনি দেখিয়ে এসেছেন—তিন হাজার ছয় শত নয় টাকা মাত্র।

যমরাজ ॥ (পরমানন্দকে) সত্য ?

পরমানন্দ ॥ সম্পূর্ণ সত্য ধর্মরাজ। মহামান্য চিত্রগুপ্ত বর্ণিত টাকার সংখ্যাও সত্য, আমার উল্লিখিত আয়ের পরিমাণও সত্য। প্রথমটা হলো গিয়ে দান, আর পরেরটা হলো গিয়ে আয়। আয়করটা আয়ের উপরই দেওয়া বিধি। আমি তাই-ই দিয়ে এসেছি।

যমরাজ ॥ যা বলছো, তা কি আয়কর বিভাগ মেনেছে ?

পরমানন্দ ॥ না মেনে উপায় ছিল না ধর্মাবতার। দানের হিসাব রাখতে আমাদের কোন খাতাপত্র থাকে না।

যমরাজ ॥ বল কিহে ? এতো টাকা,—আর তার কোনো হিসাব থাকে না ?

পরমানন্দ ॥ আজ্ঞে, কেন থাকবে না ধর্মরাজ! সে হিসাব থাকে আমাদের মনের খাতায়—প্রাণের পাতায়। •

যমধাজ ॥ হুঁ ! আয়করের নাগালের বাইরে তোমার হিসাব মতো ঐ অল্প-স্বল্প আয়টা হয়েছে কোত্থেকে ?

পরমানন্দ ॥ আজ্ঞে দেখুন ভক্তরা ছাড়ে না। আধি-ব্যাধি কার নেই বলুন ? এমন আকুল হয়ে সবাই কাঁদবে যে, হয় তাবিজ-কবচ, না হয় ওষুধপত্র—একটা কিছু দিতেই হয়। নইলে তিষ্ঠানো যায় না ধর্মরাজ। তা এসবের আবার একটা খরচ আছে। তাই, দক্ষিণাই বলুন, আর প্রণামীই বলুন,—ভক্তরাই দিয়ে থাকে। যতো বলি নেবো না, শুনছে কে ? অবোধদের ধারণা,—এসব যদি না নিই, ব্যাধির প্রায়শ্চিত্ত হবে না—ফলও কিছু হবে না।

যমরাজ। তা ফল কিছু হতো ?

পরমানন্দ ॥ একটা কিছু দিলে—হয় ফল হবে, আর না হয় হবে না। যাদের ফল হলো—হলো। যাদের হ'লনা—তারা দেখলো, অপরের যখন ফল হয়েছে—সুফল ফলেছে, তখন তাদের নিশ্চয়ই ভক্তির অভাব ছিল—বিশ্বাসের অভাব ছিল। দোষটা তাদেরই।

যমরাজ ॥ মানে, এ নিয়ে মাথাটা তারাই ঘামাতো,—তোমার ঘামাতে হতো না—কেমন ?

পরমানন্দ ॥ আপনি সর্বজ্ঞ। আপনাকে বুঝিয়ে বলবার মতো আমার কিছুই নেই ধর্মরাজ।

চিত্রগুপ্ত ॥ তা বটে! কিন্তু একটা জিনিস তো ভাল বোঝা যাচ্ছে না অবধূত। উপাধিতে বোঝা যাচ্ছে তুমি সন্ন্যাসী; কিন্তু আচরণে দেখা যাচ্ছে, তুমি বিষয়ী, গৃহী। তোমার আশ্রমে যে কামিনী-কাঞ্চনের সমারোহ ছিল, রাজ সংসারেও তা বিরল।

পরমানন্দ ॥ আপনারা সর্বদ্রষ্টা। আপনার কথা যথার্থ মহামান্য চিত্রগুপ্ত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী, স্মরণ করুন,—

"বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।"

আমার নীতিও ছিল তাই।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ স্বামীজি মিথ্যা বলেননি। কাঞ্চনের অঙ্ক পূর্বেই পেশ করেছি। এবার কামিনীর সংখ্যাটা শুনুন। স্বামী পরমানন্দ মহারাজ ষোল শত একজন নারীর স্বামী; তন্মধ্যে বৈধের সংখ্যা তেত্রিশটি!

যমরাজ ॥ ওরে বাবা! বলো কী চিত্রগুপ্ত! সমাজে এ নিয়ে আন্দোলন হয়নি?

চিত্রগুপ্ত। হবে কি করে ধর্মাবতার? এ সবইতো হয়েছে—ধর্মের নামে—ধর্মের আবরণে।

যমরাজ ॥ তা ঠিক। ধর্মের নামেই সব চেয়ে বেশী অধর্ম হয়ে থাকে দেখেছি। খৃষ্ট, বুদ্ধ,—জগতের প্রায় সব ধর্মপ্রচারকেরাই শান্তি ও অহিংসাই পরম ধর্ম বলে ঘোষণা করে গেছেন। কিন্তু সেই সব ধর্মাবলম্বী লোকেরাই শান্তির নামে, ন্যায়ের নামে কী হানাহানি—কী রক্তারক্তিই না করছে! কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না চিত্রগুপ্ত। ধর্মের নামে অধর্ম হচ্ছে—বাইরের লোক না দেখুক, কিন্তু এদের ভেতরের লোকেরা তো এ সব অনাচার—এ সব ব্যভিচার স্বচক্ষে দেখছে। তারা কেন এর প্রতিবাদ করে

না—এর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ায় না? মানুষ কি আজ এতো নীচে নেমে গেছে?

চিত্রগুপ্ত ॥ ভেতরের লোকেরা হয় এর সম্মোহনী শক্তিতে আচ্ছন্ন—অন্ধ; নতুবা কামিনী-কাঞ্চনের প্রসাদ-লুব্ধ।

যমরাজ ॥ (পরমানন্দের প্রতি) তুমি কী গুরুতর পাপ করেছো—বুঝতে পারছো অবধূত?

পরমানন্দ ॥ কেন বুঝবো না প্রভু? আমি ইচ্ছা করেই পাপ করেছি ধর্মরাজ।

যমরাজ ॥ কী সর্ব্বনাশ! তুমি কী বলছো অবধূত? আর তা বলছো আমার সামনে? তোমার শেষ বিচারে?

পরমানন্দ ॥ হ্যাঁ প্রভু। ইচ্ছা করে পাপ করেছি। কারণ আমি জানি, —ঈশ্বর করুণাময়—ঈশ্বর দয়াময়। সে করুণা—সে দয়া কার জন্য? পাপীর জন্য—তাপীর জন্য। পাপ করলে তবেই না ক্ষমা—তবেই না করুণা। আমি জানি আমার মতো পাপীও কেউ নেই, —ঈশ্বরের মতো পাপঘ্নীও কেউ নেই।

"মৎসম পাতকী নাস্তি।
পাপঘ্নী ত্বৎসম নহি।"

আমি যত পাপই করে থাকি না কেন, তার কৃপা পারাবারের তুলনায় তা অতি তুচ্ছ—অতি নগণ্য। নয়কি ধর্মরাজ?

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রভু!

যমরাজ ॥ লোকটি খুব চালাক।

চিত্রগুপ্ত ॥ মর্ত্য থেকে আজকাল যে সব চালান আসছে, বেশীর ভাগই এ-ই।

যমরাজ ॥ তাই দেখছি। লোকটি সত্যিই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। একে কী দণ্ড দেবো, অথবা দণ্ড দেবো কিনা—সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

পরমানন্দ ॥ জানি মহারাজ,—"ধর্মস্য সূক্ষ্ম গতি।" আমার আশা-ভরসা ঐখানেই।

যমরাজ ॥ এর বিচার আজ মুলতুবী থাক্।

চিত্রগুপ্ত ॥ আমাদের প্রচলিত দণ্ডবিধি বড় সেকেলে—বড় পুরোনো হয়ে গেছে ধর্মরাজ। এটাও কিন্তু ভেবে দেখবার বিষয়।

॥ চিত্রিতা ॥
পূজা সংখ্যাঃ ১৩৬১

যমরাজ ॥ তা ভাববো, কিন্তু আজ আমি ক্লান্ত। আর একটি মাত্র বিচার আজ আমি করবো। আজকের তালিকা—

চিত্রগুপ্ত ॥ এই যে ধর্মাবতার।

[চিত্রগুপ্ত তালিকাটি যমরাজের নিকট পেশ করিল।]

যমরাজ ॥ (তালিকাটি পরীক্ষা করিয়া) দেশনেতা স্বদেশ চৌধুরী। দেশনেতা যখন,—ভালো লোকই হবেন বোধহয়। ডাকো— স্বদেশ চৌধুরী

চিত্রগুপ্ত ॥ কিন্তু ধর্মাবতার—

যমরাজ ॥ না, না, চিত্রগুপ্ত, আজ আমি বড় ক্লান্ত—বেশী ঝামেলায় যেতে চাই না।

[চিত্রগুপ্ত নীরব হইলেন। দণ্ডধারী বাহিরে গিয়া স্বদেশ চৌধুরীকে লইয়া আসিয়া কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া দিল।]

চিত্রগুপ্ত ॥ তোমার নাম স্বদেশ চৌধুরী ?

স্বদেশ ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে আমার বন্ধুরা আমাকে "দেশপ্রদীপ" আখ্যাও দিতে চেয়েছিলেন এক সময়, কিন্তু আমি রাজী হইনি।

যমরাজ ॥ তাই নাকি ! পেশা নেতাগিরি ?

স্বদেশ ॥ আজ্ঞে,—দেশ-সেবা।

চিত্রগুপ্ত ॥ আমার খাতায় দেখতে পাচ্ছি ধর্মাবতার, দেশ-সেবা নয়— পেশা ছিল নেতাগিরি।

স্বদেশ ॥ তাও বলতে পারেন। দেশের লোক আমাকে ভালবেসেই তাদের নেতা করেছিল। আজ এই চরম বিচারের দিনে এ কথা

বলতে আমার কুণ্ঠা নেই সে নেতৃত্বের মর্যাদাও আমি রেখেছি। দেশকে পরাধীনতার অশুচি থেকে মুক্ত করতে যে মুষ্টিমেয় নেতা জীবন পণ করে ছিলেন—বহু ত্যাগ স্বীকার করে জাতিকে অবশেষে জয়-গৌরবে বিভূষিত করেছিলেন—দেশ-মাতৃকাকে পরাধীনতার নাগ-পাশ থেকে মুক্ত করেছিলেন--আমিও তাঁদেরই একজন। এ কথা আমি নিজমুখে ঘোষণা করতে লজ্জা অনুভব করছি। তবু এই শেষ বিচারে তা না বলেও উপায় নেই, কারণ খবরের কাগজ-গুলো সঙ্গে আনতে পারিনি। একটা আত্মজীবনী লেখা শুরু করেছিলাম—শেষ হবার আগেই ডাক এলো, খালি হাতেই চলে আসতে হলো।

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত ॥ আসামীর দলীয় কাগজগুলো এই সব কথাই চিরদিন ফলাও করে বলেছে। বিরুদ্ধ দলের কাগজগুলো উল্টো গান গেয়েছে। কিন্তু ধর্মাবতার, খবরের কাগজের প্রমাণ এ বিচারালয়ে অপ্রাসঙ্গিক—অচল।

যমরাজ ॥ তা-তো বটে। তোমার খতিয়ানে কী দেখছো, চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ আমার খতিয়ানে যা দেখছি, তাতে আমিই বিপন্ন বোধ করছি ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ কেন? কেন চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ আমাদের দণ্ডবিধি দস্তরমত সংশোধন করতে হবে এই দেশ-প্রদীপের নাগাল পেতে।

যমরাজ ॥ কেন—কেন চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ আমি জেরা করছি,—আপনি দেখুন ধর্মাবতার। (আসামীর প্রতি) চোরকে চুরি করতে বলে গৃহস্থকে সজাগ থাকতে বলা—এই যে একটা চালাকি মর্ত্যে চালু আছে, সেই নীতিটাই কলাবিদ্যা হিসাবে তুমি প্রয়োগ করেছিলে—তোমার দেশ-সেবার সর্ব আন্দোলনে। এ কথা কি তুমি অস্বীকার করবে?

স্বদেশ॥ কখনও না। সারা জীবনেই আমি এই নীতি প্রয়োগ করেছি আমার আন্দোলনে। করেছি ইচ্ছা করে। আমি বুঝেছিলাম, দেশকে মুক্ত করতে হ'লে তার জন্যে উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে,—দিতে হবে রক্ত—দিতে হবে জীবন। বিদেশী রাজ-শক্তিকে গোপনে সাবধান করে দিতাম বলেই তাঁরা পূর্বাহ্নেই থাকতেন প্রস্তুত। তাঁদের কাবু করা হতো না সহজ। লড়াইটা হতো ঘোরালো, আমাদের যুবশক্তিকে তাই বরণ করতে হতো অসীম দুঃখ—অবর্ণনীয় কষ্ট—অপরিসীম আত্মত্যাগ। জানেন তো ধর্মরাজ, চালাকির দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না। স্বাধীনতা-অর্জনের মতো একটা মহৎ কাজ যাতে চালাকিতে না হয়, সেই ব্যবস্থাই আমি করেছিলাম, ধর্মরাজ।

যমরাজ॥ চিত্রগুপ্ত! এটা দোষ না গুণ?

চিত্রগুপ্ত॥ আমাদের দণ্ডবিধি ভাবগ্রাহী। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছলের আশ্রয় গ্রহণ করা ক্ষমার্হ বিবেচিত হ'তে পারে রাজনীতিতে। প্রচলিত রাজনীতিতে এ ব্যক্তি ক্ষমার্হ। কিন্তু আমি নিবেদন করবো ধর্মরাজ, এ লোকটির এই ছলের পশ্চাতে স্বীয় স্বার্থ-সিদ্ধি ভিন্ন কোন মহৎ উদ্দেশ্যই ছিল না। দেশের যাঁরা স্বাধীনতা সত্যিই চেয়েছিল, এ লোকটি সেই কোটি কোটি লোকের কেউ নয়। এ লোকটি মুষ্টিমেয় সেই কতিপয় লোকের অন্যতম—যারা অন্যের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছিল।

যমরাজ॥ সাংঘাতিক!

চিত্রগুপ্ত॥ আরো সাংঘাতিক এই জন্য যে, দেশের লোক এর মৃত্যুকে মহাপ্রয়াণ বলছে—সহরে সহরে শোক-সভা করছে।

স্বদেশ॥ আপনি আমাকে ভুল বুঝতে পারেন মহামান্য চিত্রগুপ্ত। কিন্তু আমি জানি, দেশের লোক আমাকে ভুল বুঝবে না। এ বিষয়ে আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল, তাও দূর করলেন আপনি। দেশের লোক আমার শোকে সত্যে সত্যই কাঁদে কিনা, মারা

যাওয়ায় সেটা জানতে পারছিলাম না। যমপুরীতে এসে সবচেয়ে যে জিনিষটার অভাব বড় বেশী অনুভব করছিলাম, সেটা হলো একখানা খবরের কাগজ। তা' যাক, খবরটা আমি আপনার কাছেই পেলাম—দেশের লোক সহরে-সহরে আমার মৃত্যুতে শোকসভা করছে।

চিত্রগুপ্ত ॥ তা করছে। কিন্তু এটা শুনে আপনি অবাক হয়ে যাবেন ধর্মরাজ,—এই সব শোকসভা অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের এই দেশ-প্রদীপ স্বদেশ চৌধুরী তাঁর দলের হাতে প্রচুর টাকা রেখে এসেছেন।

স্বদেশ ॥ আমি প্রতিবাদ করছি ধর্মরাজ। এ টাকা আমি দেইনি, দিয়েছে দেশের লোক—তুলেছি আমি। মহাপ্রাণ নেতাদের মৃত্যুতে শোকসভা অনুষ্ঠানের জন্য একটা ফাণ্ড্ থাকাই উচিত। কর্তব্য বুদ্ধিতেই এ রকম একটা ফাণ্ড্ আমি স্থাপন করে এসেছি। আমার জীবদ্দশাতেও মহাপুরুষদের এমনি স্মৃতি-পূজা আমিও বহুবার করেছি এই ফাণ্ডেরই সাহায্যে। আমার মৃত্যুতে আমার বন্ধুরাও আজ সেই কর্ত্তব্য পালনই করছে, এতে অন্যায়ের কি আছে ধর্মরাজ?

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত।

চিত্রগুপ্ত ॥ অন্যায়টা ফাণ্ড খোলাতে নয়, ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ তবে?

চিত্রগুপ্ত ॥ ভাল কাজের নামে ফাণ্ড খুলে ফাণ্ডের সেই টাকা ডান হাত বাঁ হাত করাতে।

যমরাজ ॥ এ লোকটি কি তাই করেছে?

চিত্রগুপ্ত ॥ করেছে কিনা আসামীর নিজমুখেই শোনা যাক্, ধর্মাবতার। শুধু স্মৃতি-পূজার স্মৃতি-রক্ষার ফাণ্ড কেন? ওঁর সুদীর্ঘ নেতৃত্বকালে অমন বহু ফাণ্ড উনি স্থাপন করেছেন, এই ধরুন,—যেমন দুর্ভিক্ষ-রোধ ফাণ্ড—বন্যা-ত্রাণ ফাণ্ড—সমাজ সেবা ফাণ্ড—এক কথায়, যখনই

দেশে কোনো আপদ বিপদ দেখা দিয়েছে, ওর প্রাণই কেঁদেছে সকলের আগে—সবচেয়ে বেশী।

স্বদেশ ॥ দুঃখীর দুঃখ দূর করতে এগিয়ে যাওটা কি অধর্ম হয়েছে ধর্মরাজ? তবে হয়তো মহামান্য চিত্রগুপ্ত তাঁর খতিয়ান দেখে একথা বলবেন, দুঃখীর দুঃখ দূর করতে গিয়ে নিজের ভাত-কাপড়ের দুঃখও আমি খানিকটা লাঘব করেছি। আমি বলবো, আমি তা করেছি। সারাজীবন আমার এই মূলমন্ত্রই ছিল,—"সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত!

চিত্রগুপ্ত ॥ ধর্মরাজ! লোকটি মিথ্যা বলেনি। দুঃখীর দুঃখ-ত্রাণে কাজও যে কিছু না হয়েছে, তাও নয়—তবে, দশ আনা-ছ'আনা—কোন কোন ক্ষেত্রে আধা-আধি—এই হারে। মানে—দশ আনা বা আট আনা এই সব কর্মকর্তাদের পকেটেই গেছে।

স্বদেশ ॥ যেতে পারে—তা যেতে পারে ধর্মাবতার। আর্তত্রাণের কাজেও একটা খরচা আছে। কোন্ কাজে খরচা নেই? এমন কি, মড়া পোড়ানো—তাওতো বিনি পয়সায় হয় না। মহামান্য চিত্রগুপ্ত এই সব অনিবার্য খরচা সম্পর্কেই বোধ হয় কটাক্ষ করছেন, ধর্মরাজ। কিন্তু সব খরচারই হিসাব আছে। যাঁরা চাঁদা-টাদা দেন, তাঁদের নামও আমরা খবরের কাগজে ছেপে দিই। সব কিছুই অডিট্ হয়। ফাণ্ডের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে এ সব হিসাব আমি পাশ করিয়েও এসেছি। দোষটা আমার কোথায়,—এখনো বুঝলাম না ধর্মরাজ।

চিত্রগুপ্ত ॥ বেশ, বেশ, এসবও আমরা বুঝছি। কিন্তু শুধু বক্তৃতা আর নেতাগিরি করে বাড়ী আর গাড়ীর মালিক হলে কি করে—এটা আমাদের বুঝিয়ে দাও দেখি, দেশ-প্রদীপ স্বদেশ চৌধুরী।

স্বদেশ ॥ হুজুর ধর্মাবতার! এ সব হচ্ছে গিয়ে—আমার প্রিয় দেশবাসীর অজ্ঞাত দান—গোপন দান। হুজুররা অন্তর্যামী—সবই তো জানেন। তবে হ্যাঁ, একটা বিষয় আমার বলার আছে—আমি

বলবোও। নেতাগিরি করা মানে পুষ্প-শয্যায় থাকা নয়। ঝড়-ঝাপ্টা অনেক কিছু সইতে হয়। আর তার জন্য শক্তি চাই—স্বাস্থ্য চাই—অদম্য উৎসাহ চাই। তাই এ সবের খোরাকও চাই। আর এ খোরাক—নেতাগিরির প্রাপ্যও বটে। বলতে আজ আমার আনন্দই হচ্ছে,—দেশবাসী আমার এ খোরাক ইচ্ছায় হোক্—অনিচ্ছায় হোক্ বরাবর জুগিয়ে এসেছে। আর তা জুগিয়ে এসেছে বলেই—আমি আমরণ নেতৃত্বের শক্তি পেয়েছি—যে সে শক্তি নয়, বিপ্লবের শক্তি—যে শক্তি স্বাধীনতা-অর্জনের পরও আপোষহীন সংগ্রামে মত্ত ছিল।

যমরাজ ॥ আপোষহীন সংগ্রাম! সেটা আবার কি?

স্বদেশ ॥ আজ্ঞে, বিশ্বশান্তির জন্য বিরামহীন সংগ্রাম।

যমরাজ ॥ ওরে বাবা! চিত্রগুপ্ত—!

চিত্রগুপ্ত ॥ প্রভু!

যমরাজ ॥ চিত্রগুপ্ত! এই পরমাত্মাটিকে আমি কোথায় রাখবো চিত্রগুপ্ত?

চিত্রগুপ্ত ॥ ইনি আমাদের প্রচলিত আইনের বাইরে--আমিতো বলেছি ধর্মাবতার।

যমরাজ ॥ হ্যাঁ, তুমি বলেছো। আচ্ছা, আমি ভেবে দেখি। নরকে এর স্থান হবে বলে মনে হচ্ছে না।

স্বদেশ ॥ আমি জানি—আমি জানি। আমার দেশের লোক স্বর্গেই আমার সদ্‌গতি হোক্—প্রতিটি শোকসভায় কামনা করছে। এখন ধর্মরাজের দয়া।

যমরাজ ॥ আমি ভেবে দেখছি—আমি ভেবে দেখছি। এরা এত এগিয়ে গেছে, আর আমরা এত পিছিয়ে আছি। যাক্, আজকের মতো বিচার শেষ।

স্বদেশ ॥ ধর্মরাজ জিন্দাবাদ—ধর্মরাজ জিন্দাবাদ—ধর্মরাজ জিন্দাবাদ!

যবনিকা

॥ সংহতি ॥
আশ্বিন: ১৩৬১

বিবসনা

[রাত তখন অনেক। দিব্যেন্দু সবে ঘুমিয়েছে। ঘরে জ্বলছে নীলরঙের বাল্ব। বিনতা এবার শুতে যাবে। একবার আড়মোড়া ভেঙ্গে নেয় বিনতা। এগিয়ে যায় জানলার কাছে। বাইরে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠে। আবার দু'হাতের চেটোয় চোখ মুছে তাকায় ভাল করে, তারপর ছুটে এসে দিব্যেন্দুকে ডাকে।]

বিনতা॥ এই শোনো, ওঠো—

দিব্যেন্দু॥ আঃ

বিনতা॥ ওঠো বলছি।

দিব্যেন্দু॥ নাঃ কাঁচা ঘুমটা ভেঙে দিলে।—কেন বলতো?

[ধড়মড় করে দিব্যেন্দু উঠে বসে]

বিনতা॥ বাগানে কে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

দিব্যেন্দু॥ এত রাতে।

বিনতা॥ হ্যাঁ···একটা সোমত্ত মেয়ে··

দিব্যেন্দু॥ বলকি। কই?

বিনতা॥ এখন অবশ্য দেখছি না। কিন্তু দেখেছি। এমন কিছু দেখেছি যা বলতে বাধে।

দিব্যেন্দু॥ বলকি রাণী।

বিনতা॥ হ্যাঁ। তুমি তো দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলে, আমার ঘুম পেল না। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। চমৎকার জ্যোৎস্না—সারা পৃথিবী ঘুমুচ্ছে—শুধু চাঁদ জেগে আছে আর আমি।... হঠাৎ—

দিব্যেন্দু॥ বল।

বিনতা॥ হঠাৎ দেখলুম হাসনুহানার ঝোপের ধারে—

দিব্যেন্দু॥ একটা সোমত্ত মেয়ে। তোমার মাথা খারাপ হয়েছে রাণী।

[দিব্যেন্দু হেসে উঠে]

বিনতা॥ আমি স্পষ্ট দেখলাম···তবু বলবে মাথা খারাপ হয়েছে।

দিব্যেন্দু ॥ পাঁচীল ঘেরা বাড়ী—রাত দুপুর—আর তুমি দেখলে একটা মেয়ে হাসনুহানার ঝোপে—

বিনতা ॥ শুধু কি তাই ? বলতে বাধছে…

দিব্যেন্দু ॥ কি ?

বিনতা ॥ কাপড় নেই।

দিব্যেন্দু ॥ মানে ন্যাংটো।

বিনতা ॥ হ্যাঁ।

[দিব্যেন্দুর গলায় অবিশ্বাসের সুর]

দিব্যেন্দু ॥ তুমি দেখেছ ?

বিনতা ॥ আমি দেখেছি।

দিব্যেন্দু ॥ মনে হয় এখনো এখানে রয়েছে ?

বিনতা ॥ কি করে বলব। এদিক ওদিক তাকালো এক পা দু পা এগুলো চার দিক চেয়ে দেখলো, তারপর বোধহয় আমায় দেখতে পেয়ে সরে গেল।

দিব্যেন্দু ॥ কোথায় ?

বিনতা ॥ ঝোপের আড়ালে।

দিব্যেন্দু ॥ ন্যাংটো ?

বিনতা ॥ হ্যাঁ। কিন্তু তুমি বল . আমি এসব কি দেখলাম ! লোক-জন ডাকো—দেখতে হবে।

দিব্যেন্দু ॥ তুমি স্পষ্ট দেখেছ ন্যাংটো ?

বিনতা ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ…

দিব্যেন্দু ॥ মনে করে দেখ পরনে সাদা কাপড় ছিল না তো !

বিনতা ॥ না। আমি স্পষ্ট দেখেছি। অমন জ্যোৎস্না। না, ভুল আমি করিনি। সাদা থান কাপড়, কেন ?

দিব্যেন্দু ॥ না, একটা কথা মনে পড়ল, তাই !

বিনতা ॥ কি কথা।

দিব্যেন্দু ॥ আমার এক জ্যাঠাইমা, অনেক কাল আগে অপঘাতে—

বিনতা ॥ মানে…মানে তুমি বলতে চাও—

দিব্যেন্দু ॥ হ্যাঁ, অনেকে দেখেছে —

বিনতা ॥ দেখেছে ?

[বিনতার চোখ বিস্ময়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চায়]

দিব্যেন্দু ॥ বলে তো তাই।

বিনতা ॥ না, এ সে হবে কেন। এ ভরা যুবতী মেয়ে। আর কই, সে সব কথা তো আমি শুনি নি। এও তো হতে পারে যে, আমি যে এখানে এসেছি বা আছি ও মেয়েটি শোনেনি।

দিব্যেন্দু ॥ মানে ?

বিনতা ॥ হয়ত এমনও অনেক এসেছে।

[বিনতার গলার যেন একটা বাঁকা সুর বেজে ওঠে]

দিব্যেন্দু ॥ মানে, তুমি বলতে চাও—

বিনতা ॥ আমি কিছুই বলতে চাইনা। কিন্তু বলবই না বা কেন—

দিব্যেন্দু ॥ বল।

বিনতা ॥ রাত দুপুরে, তোমার শোবার ঘরের লাগাও বাগানে এসব দেখব এ যদি জানতাম—

[এবার ধ্বনিত হয় অভিমান]

দিব্যেন্দু ॥ রাণী!

বিনতা ॥ লোকজন ডাকো বলছি। ডাকো। চল আমি নিজে যাব।

দিব্যেন্দু ॥ চল—কিন্তু—কিন্তু শোন রাণী—

বিনতা ॥ যাবে না ?

দিব্যেন্দু ॥ যাবো না কেন। কিন্তু লোকজন নিয়ে গিয়ে কিছুই দেখবো না, তুমি জানো না—এমন অনেকবার হয়েছে।

বিনতা ॥ ভূতের ভয় বলতে চাও।

দিব্যেন্দু ॥ জানিনে কি। জ্যাঠাইমা এসেছিলেন বিধবা হয়ে বাবার কাছে আশ্রয় চাইতে। বাবা রাজী হননি। জ্যাঠাইমা বললেন মোকদ্দমা করবো—এ বাড়িতে আমার অধিকার আছে—ভাত কাপড় তুমি দিতে বাধ্য। বাবা রেগে করলেন অপমান। পরদিন ভোর বেলায় দেখা গেল ঐ আমগাছটায় তার পরনের কাপড়খানি

ফাঁস দিয়ে তিনি—

বিনতা ॥ ঐ···ঐ। দেখছ?

[জানলা দিয়ে তাকিয়ে বিনতা আবার আৎকে ওঠে]

দিব্যেন্দু ॥ কিন্তু এতো···সত্যিই তো!

বিনতা ॥ একি তোমার জ্যাঠাইমা?

দিব্যেন্দু ॥ না···কিন্তু···তবু···

বিনতা ॥ তবু বলবে জ্যাঠাইমা! বলো স্বর্গে কাপড় নেই, কনট্রোল, তাই—

দিব্যেন্দু ॥ কিন্তু ও মানুষ নয়—মানুষ নয় রাণী। কোন যুবতী মেয়ে অমন ন্যাংটো হয়ে—দাঁড়াও—

বিনতা ॥ আমি জানতে চাই এসব কি।

দিব্যেন্দু ॥ না না শোন। এটা বিজ্ঞানের যুগ। গুলি ছুঁড়ে দেখবো ওটা কি।

[দিব্যেন্দু লাফিয়ে উঠে দোনালা বন্দুকটা টেনে নেয়—জানালা দিয়ে নিশানা করে বাইরে। তার পরই বন্দুকটা গর্জন করে ওঠে আর বাইরে একটা আর্তনাদ ওঠে। কালক্ষেপ সূচক অন্ধকার। একটু পরেই আলো জ্বলে উঠলে দেখা যায় ঘরের আলোটা জ্বালানো আর দিব্যেন্দুর বিছানায় শোয়ানো একটা নারীমূর্তি আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা। দিব্যেন্দু বন্দুক হাতে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে—আর বিনতাও দাঁড়িয়ে আছে খাটের বাজুতে হাত রেখে।]

নারীমূর্তি ॥ আমায় মেরেছ···ভালই করেছ···ভালই করেছ। আঃ-ওঃ-

দিব্যেন্দু ॥ কে তুমি? তুমি কে!

নারীমূর্তি ॥ কৈবর্তদের মেয়ে ফুলি। একখানা কাপড়। একখানা কাপড়। মাত্র একখানা কাপড় সাত জায়গায় জোড়া তালি দিয়ে··· কোন রকমে···আঃ

দিব্যেন্দু ॥ কোথায় সে কাপড়?

নারীমূর্তি ॥ সন্ধ্যেবেলা তালপুকুরে গা ধুতে গিয়ে···ভাবলাম কাপড়খানা ভিজলে আর তো নেই, তাই খুলে রেখে ডুব দিয়েছি, উঠে আর পেলাম না, কে চুরি করে পালিয়েছে।

[বাড়ীর বুড়ো চাকর গোবিন্দ ঢোকে]

দিব্যেন্দু ॥ ডাক্তার এসেছে ?

গোবিন্দ ॥ আসছেন।

দিব্যেন্দু ॥ হ্যাঁ, তারপর ?

নারীমূর্তি ॥ হঠাৎ দেখলাম কারা আসছে। তোমাদের খিড়কির দোর খোলা ছিল। ঢুকে পড়লাম, ঝোপের ভেতর থেকে দেখলাম তোমাদের দারোয়ান সব দরজায় তালা দিয়ে গেল আর পালাতে পারলাম না। আঃ ওঃ, তা বাবু গুলি করে মেরে ভালোই করলে। আমি বেঁচে গেলাম।

যবনিকা

বোমা

[অধ্যাপক সদাশিব ভট্টাচার্যের বাসভবনে উপবেশন কক্ষ। ডাক্তার জগবন্ধু বোস সদাশিবের স্ত্রী শ্রীমতী দিগম্বরী দেবীকে পরীক্ষা করিতেছেন। দিগম্বরী বাল্যকালে টাইফয়েড রোগাক্রান্তা হইয়া বাক্ শক্তি হারাইয়াছিলেন। স্বামী বহু চিকিৎসা করাইয়াও তাহার লুপ্ত বাক শক্তি আজ পর্যন্ত ফিরাইয়া আনিতে পারেন নাই। ডাক্তার বোস এইরূপ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ। তিনি কিন্তু হতাশ হন নাই।]

জগবন্ধু॥ (দিগম্বরীকে) আর একবার চেষ্টা করে দেখুন তো দিগম্বরী দেবী। বলতে চেষ্টা করুন 'আমি কথা বলবো।'

দিগম্বরী॥ (প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন বটে কিন্তু মুখ হইতে গোঁ গোঁ শব্দ ছাড়া অরে কোনো কথা বাহির হইল না। কথা বলিবার প্রাণপণ প্রয়াসে দিগম্বরী অবসন্ন হইযা পড়িলেন। অবশেষে হতাশ ভাবে সোফায় বসিয়া পড়িয়া মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—'পারিলাম না।')

সদাশিব॥ (ডাক্তারকে) থাক থাক, ওকে আর কষ্ট দিয়ে দরকার নেই। দেখছো ডাক্তার, সামান্য ঐ ক'টা কথা বলতে গিয়ে কি রকম অবসন্ন হয়ে পড়েছে!

জগবন্ধু॥ আচ্ছা দিগম্বরী দেবী, আপনি যান। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন।

[দিগম্বরী যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

জগবন্ধু॥ তবে এও জেনে যান দিগম্বরী দেবী, আমি এখনো হাল ছাড়িনি। এ আশা আমি এখনো রাখি, কথা আপনার মুখে ফুটবেই। আর যখন ফুটবে তখন একেবারে খৈ ফুটবে।

দিগম্বরী॥ (ডাক্তারকে ইঙ্গিতে বলিলেন, 'আপনি যাইবেন না, আমি চা পাঠাইয়া দিতেছি')

জগবন্ধু॥ (সদাশিবকে) কি যেন বলতে চাইলেন।

সদাশিব ॥ ওর না-বলা বাণী আমি বুঝি ! বলছে, 'আপনি যাবেন না, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

[ডাক্তার আনন্দে সম্মতি জানাইলেন]

জগবন্ধু ॥ আচ্ছা সদাশিব, তুমি ঠিক জানো, দিগম্বরী দেবীর বাল্যকালে যে ব্যারামে বাকশক্তি লোপ হয়েছিল, সে ব্যারামটা টাইফয়েডই কি ?

সদাশিব ॥ হ্যাঁ টাইফয়েড।

জগবন্ধু ॥ এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই ?

সদাশিব ॥ না। আমি তখন ওদের বাড়িতে থেকে পড়তাম। দিগম্বরীর বাবা ছিলেন আমার বাবার বন্ধু। বাবা তখন রাজপুতনার জয়পুরে চাকরী করতেন। বন্ধুর কাছে আমায় কলকাতায় রেখে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। দিগম্বরী আর আমি প্রায় এক সঙ্গেই মানুষ হয়েছি। ওর টাইফয়েড হলে ওর সেবা-শুশ্রূষাও করেছি আমি। তাই ঘটনাটা আমি ঠিকই জানি।

জগবন্ধু ॥ রোমান্সের গন্ধ পাচ্ছি।

সদাশিব ॥ বলতে হয় বল, কিন্তু ব্যাপারটা খুব ট্র্যাজিক। টাইফয়েডের পরেই দিগম্বরী হয়ে গেল বোবা। কিন্তু বোবা হলেও শশীকলার মত সে দিন দিন বাড়তে লাগলো। বিয়ের বয়স হলো। একে বোবা তায় লেখাপড়া শিখতে পারেনি। বাপেরও এমন কিছু পয়সা ছিল না—শুধু রূপ দেখে বিয়ে করতে কোন ছেলেই রাজি হলো না। ওর বাবা তখন চেষ্টা করতে লাগলেন দোজবরে বিয়ে দিতে—বুড়ো বরেও তাঁর আপত্তি ছিল না। কিন্তু দিগম্বরী তাতে ক্ষেপে গেল—মরীয়া হয়ে উঠলো। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো, বিয়ের কথা কেউ তুললেই তাকে কামড়াতে যেত।

জগবন্ধু ॥ ওরে বাবা, আর শেষে কিনা তাঁকে বিয়ে করলে তুমি ?

সদাশিব ॥ হ্যাঁ আমি। আমি তখন এম-এ পাশ করেছি। বাবা জয়পুর কলেজেই আমার জন্য ভালো একটা চাকরী জোগাড় করেছেন। আমি যাবো শুনে দিগম্বরী এমন ছেলেমানুষি সুরু

করলো যে কি বলবো। প্রথমে আমার ওপর হলো একচোট মারধোর, সুরু হলো আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল যে, সেটা যেমন লজ্জাকর, তেমনি মর্মান্তিক।

জগবন্ধু॥ পরের ঘটনাটা আমি বেশ অনুধাবন করতে পারছি সদাশিব। এদ্দিন এক সঙ্গে এক ছাতের তলে থাকা—মায়া মমতা না এসে পারে না। তা ছাড়া যৌবনেরও একটা মোহ আছে। তার ওপর দিগম্বরী দেবীর ছিল যাকে বলে লোভনীয় স্বাস্থ্য। কিন্তু তোমার বাবা এ বিয়েতে সম্মত হলেন?

সদাশিব॥ সেটাই খুব আশ্চর্য। বন্ধুকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে বাবার কৃতজ্ঞতার অভাব হলো না। কলকাতায় এসে তিনি শুধু বিয়ে দিলেন না, আমাকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে আনন্দ করে বললেন, খুব বেঁচে গেলে বাবা। বোবা বৌ হলে সংসারে অনেক সুখ, অনেক শান্তি।

জগবন্ধু॥ (হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে) তা তোমার বাবা মিথ্যা বলেন নি। প্রবীণ লোক। অনেক কিছু দেখেছেন, অনেক কিছু ঠেকে শিখেছেন।

সদাশিব॥ (হাসিয়া) তুমি ধরেছ ঠিক। আমার মা-বাবার মধ্যে বনিবনাটা একটু কম। অবশ্য সংসার অচল হবার মত কিছু নয়।... ঐ শুনছো?

[নেপথ্য হইতে দিগম্বরীর গোঁ গোঁ শব্দ ভাসিয়া আসিল। স্পষ্ট বোঝা গেল তিনি কথা বলিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিতেছেন।]

জগবন্ধু॥ হ্যাঁ, কথা বলতে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এবং এ-ও তোমাকে বলে রাখছি প্রফেসর, কথা ওঁর মুখে ফুটবেই—আজই হোক বা কালই হোক। আমি চিকিৎসার ত্রুটি রাখিনি। Latest treatment-ই আমি করেছি।

সদাশিব॥ তোমাকে ভাই আমি ধন্বন্তরী বলেই জানি।

জগবন্ধু॥ সেটা তোমার বাড়াবাড়ি। আবার কাল খবর নেব।

[এমন সময় ভৃত্য কৈলাস চায়ের ট্রে রাখিয়া গেল।]

সদাশিব॥ না না বসো। চা এসে গেল যে!

জগবন্ধু॥ না না, Excuse me please! (ঘড়ি দেখিয়া) আমার আর একটা ভারী জরুরী কল আছে। কথায় কথায় আমাব বড্ড দেরী হয়ে গেছে। কাল এসে চা খাবো।

[প্রস্থান করিতে উদ্যত এমন সময় একটি সুদর্শনা তরুণী বাহিব হইতে প্রবেশ করিলেন।]

জগবন্ধু॥ (তরুণীকে) নমস্কার! আপনি ঠিক সময় এসে গেছেন কেকা দেবী। আপনার চা রেডি। চা খেতে খেতে আপনার নোতুন কবিতা প্রফেসরকে পড়ে শোনান, দেখবেন রস আবো জমে উঠবে।

[ডাক্তার বোস ঝড়ের বেগে কথাগুলি বলিয়া ঝড়েব বেগেই চলিযা গেলেন]

সদাশিব॥ এস কেকা, এস। চা টা ঢালো—তারপর কবিতার খাতা খোলো।

কেকা॥ (চা ঢালিতে ঢালিতে সস্মিত মুখে) খুব উল্লাস দেখছি আজ তোমার শিবুদা। ব্যাপার কি?

সদাশিব॥ মনে হচ্ছে দিগম্বরীর মুখে আবার কথা ফুটবে। তোমার কবিতার খাতা খোল কেকা। 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' জাতীয় কোন একটা লেখা শোনাও।

কেকা॥ দিগম্বরী দেবীর মুখে কথা ফুটলে আমার কথাটি ফুরোবে, নটে গাছটি মুড়োবে, বুঝলে শিবুদা।

সদাশিব॥ কেন, একথা বলছো কেন কেকা?

কেকা॥ বৌদির মুখে ভাষা ছিলনা বলেই আমার ভাষা তোমার কানে উঠেছে। বৌদি চোখ পাকিয়ে পাকিয়ে তা শুধু দেখেছেন, নিতান্ত বোবা বলেই বাধা দেন নাই।

সদাসিব॥ না-না! মুখে কথা ফুটুক, দেখো উনিও আমাদেব কাব্যালোচনায় যোগ দেবেন সানন্দে—গরম চা আর মুখরোচক শিঙাড়া হাতে।

কেকা ॥ তোমরা মেয়েদের মনটা আজও বুঝলে না শিবুদা। কেন ভুলছ আমি তোমার বন্ধু নই, বান্ধবী। তোমার বন্ধুকে তিনি ভালবাসবেন, মানে, বিশ্বাস করবেন, বান্ধবীকে নয়।

[দেখা গেল, দিগম্বরী উঁকি দিয়া ইঁহাদের দেখিয়া গেলেন।]

সদাশিব ॥ দিগম্বরীর ওপর তুমি অবিচার করছ কেকা।

কেকা ॥ তোমার এ কথার খানিকটা দাম আমি হয়তো দিতাম, যদি না তিনি এইমাত্র আমাদের উঁকি দিয়ে দেখে না যেতেন।

সদাশিব ॥ তাই নাকি? দেখে গেলেন?

কেকা ॥ আমার চোখে পড়তেই সবে গেলেন। এইটেই স্বাভাবিক।

সদাশিব ॥ হবে। কিন্তু, আমি তো কারণ ভেবে পাই না। দিগম্বরী তেমন শিক্ষিতা নয় সত্য, কিন্তু, তাই বলে এতটা অনুদার হবে কেন?

কেকা ॥ ওটা মেয়েদেব ধর্ম। শিক্ষিতাই হোক্ আর অশিক্ষিতাই হোক্—মেয়েরা স্বামীকে চায় পুরোপুরি, ষোল আনা।

সদাশিব ॥ কি বিপদ! তোমার সঙ্গে বসে কাব্যালোচনা করব, এতে স্বামীকে পুরোপুরি পাওয়া না পাওয়ার সঙ্গে কি সম্পর্ক!

কেকা ॥ ওটা তুমি বুঝবে না, আমি বুঝি।

সদাশিব ॥ তুমি আবার কি বুঝবে! তুমি তো বিয়েই করনি।

কেকা ॥ বিয়ে করিনি সত্যি, কিন্তু, তাই বলে কাউকে ভালোবাসিনি, তাই বা তুমি কি করে মনে করছ শিবুদা?

সদাশিব ॥ বটে! বটে!

কেকা ॥ থাক এ সব কথা। একটা কথা আজ জেনে রাখো শিবুদা। দিগম্বরী দেবীর মুখে কথা ফুটলে, আমার মুখে আর কথা সরবে না। আমার কবিতা তার ছন্দ হারাবে, হয়ে যাবে নীরস গদ্য। কেন হবে—সে তুমি বুঝবে না শিবুদা।

[ইতি মধ্যে পাশের ঘরে দিগম্বরীর কথা শোনা গেল। সদাশিব ও কেকা চমকাইয়া উঠিলেন। আনন্দে চেঁচাইতে চেঁচাইতে ছুটিয়া আসিলেন দিগম্বরী।]

দিগম্বরী ॥ আমি কথা বলবো। আমি কথা বলছি। (কিন্তু তাঁহার এই উদ্যম ও উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হইয়া গেল—যে মুহূর্তে তিনি দেখিলেন তাঁহার স্বামীর পাশে বসিয়া রহিয়াছেন স্বামীর বান্ধবী সুন্দরী কেকা। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে কেকাকে) তুমি এখানে কেন? সোমত্ত মেয়ে তুমি পর-পুরুষের গা ঘেঁসে বসো কেন? লজ্জা করে না? এদ্দিন কথা বলতে পারিনি—তাই এ সব বেহায়াপনা চুপ করে সহ্য করেছি, কিন্তু আজ আর সইবো না। বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

সদাশিব ॥ (চরম বিব্রত হইয়া) ছিঃ। দিগম্বরী, শোন, শোন—

দিগম্বরী ॥ ছিঃ? তার মানে মজেছ? আমার ঝাঁটাগাছটা কোথায়? রসো, তোমাদের দু'জনকেই আমি দেখছি।

[ঝাঁটা আনিতে অন্দরে ছুটিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাসনপত্র ছুড়ে মারার শব্দ এল]

কেকা ॥ এইবার বোঝো, আমার কথা সত্য কিনা এইবার বোঝো শিবুদা। একি। এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার। বাসনপত্র ছুড়ে মারছে!

সদাশিব ॥ ছি। ছি। (উর্দ্ধে তাকিয়ে) হে ঈশ্বর, আমার দিগম্বরী আবার বোবা হোক্, তা' না হলে দেখছি রক্ষে নেই—

কেকা ॥ তুমি ভুল করছো শিবুদা। বছরের পর বছর ঈশ্বরকে ডেকে দিগম্বরী দেবীর জন্যে আজ তুমি যে বর লাভ করেছ, তোমার এক-দিনের প্রার্থনায় তিনি সে বর ফিরিয়ে নেবেন বলে মনে হচ্ছে না।

(অন্যঘরে), দিগম্বরী ॥ কই, পাচ্ছি না তো। কোথায় গেল ঝাঁটা-গাছটা? আজ ঝেঁটিয়ে সব পাপ বিদেয় করব।

সদাশিব ॥ পালাও কেকা, এখনি পালাও। বাসনপত্র ছুড়ে মারছে। টেবিল চেয়ার ভাঙছে। রণচণ্ডী মূর্তি দেখছি।

কেকা ॥ তোমারো পালানো উচিত শিবুদা। ঐ পায়ের শব্দ পাচ্ছি—ঐ ঝাঁটার শব্দ। এদিকেই আসছে শিবুদা, এদিকেই আসছে।

সদাসিব ॥ ওরে বাবা। তাই তো! আমার বাবা যে কত বড় জ্ঞানী ছিলেন আজ বুঝছি।

(উভয়ের পলায়ন। অন্যদিক হইতে ঝাটা হস্তে দিগম্বরীরপ্রবেশ।)

দিগম্বরী ॥ পালিয়েছে। একেবারে জোড়ে। (স্বামীর উদ্দেশ্যে) কিন্তু তুমি? তুমি পালিয়ে যাবে কোথায়? পিণ্ডি গিলতে বাড়ি আসতে হবে না? আজ আমার মুখ খুলেছে—বান ডেকেছে আমার মুখে। কে রুখবে, এস, আজ কথার বোম মেরে উড়িয়ে দেব সব। আজ এ এ পাড়ার কোনো চালে কাক চিলটি বসতে দেব না। হাঃ--হাঃ—হাঃ [ঝাঁটা হস্তে উন্মত্তবৎ নৃত্য।]

[পট ক্ষেপণ]

(পুনরায় পটোত্তোলন। কয়েক দিন পরের ঘটনা। অধ্যাপক সদাশিব ভট্টাচার্যের সেই উপবেশন কক্ষ। সদাশিব ক্লান্ত দেহে একটি আরাম কেদারায় অর্দ্ধশয়ান রহিয়া একটি সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ভৃত্য কৈলাসের প্রবেশ। তাহার হাতে একটি ধুমায়িত ধুপদানি)

সদাশিব ॥ কর্ত্রী কোথায়?

কৈলাস ॥ শানওয়ালা ডেকে আঁষ বঁটিতে ধার দেওয়াচ্ছেন।

সদাশিব ॥ ওরে বাবা! কেন রে?

কৈলাস ॥ দরকার পড়েছে, দিচ্ছেন।

(বাইরের কলিং বেল বাজিয়া উঠিল)

সদাশিব ॥ ঐ বুঝি জগবন্ধু-ডাক্তার এলেন। দেখ কৈলাস, ধুপ-ধুনাতেও আমার গায়ের গন্ধ যাচ্ছে না। ডাক্তারকে ঘরে এনে সেণ্টের শিশিটা দিয়ে যাস।

কৈলাস ॥ আজ্ঞে কর্তা। (চলিয়া যাইতেছিল)

সদাশিব ॥ শোন কৈলাস। কর্ত্রীর মেজাজটা এখন কেমন বুঝছিস?

কৈলাস ॥ ও হ'লো গিয়ে শালগ্রামের শোয়া-বসা,—বোঝা দায়।

(কৈলাস বাহিরের দরজায় গিয়া ডাক্তারকে লইয়া আসিল)

সদাশিব ॥ আরে এসো, এসো ডাক্তার। গিন্নী তোমাকে পরশুদিন

কল্ দিয়েছিলেন। এলে আজ। সাহস খুব! তবে আজ এসে ভালই হয়েছে। আমাকেও দেখতে হবে।

জগবন্ধু॥ কেন তোমার আবার কি হল প্রফেসর?

(ইতিমধ্যে কৈলাস সেন্টের শিশি আনিয়া দিল)

সদাশিব॥ আমার গায়ে দুর্গন্ধ পাচ্ছো না একটা? (কৈলাসকে) ও দু'এক ফোঁটা সেন্টে কিছু হবে না, শিশিটা গায়ে ঢেলে দে।

জগবন্ধু॥ আরে, রাখো রাখো, ব্যাপার কি?

সদাশিব॥ (সেন্টের শিশিটা হাতে লইয়া কৈলাসকে) আচ্ছা তুই যা। পাঁচ মিনিট পর তোর কর্ত্রীমাকে বলবি ডাক্তার সাহেব এসেছেন।

কৈলাস॥ খবর দেব পাঁচ মিনিট পর, সে কি কর্তা, তবে কি আমার রক্ষে আছে।

সদাশিব॥ আরে বাপু তো না হলে আমার রক্ষে নেই। যা।

(কৈলাসের প্রস্থান)

জগবন্ধু॥ ব্যাপার কি প্রফেসর, ব্যাপার কি? একটা ভীষণ কিছু ঘটেছে মনে হচ্ছে।

সদাশিব॥ আমার গায়ে কোনো গন্ধ পাচ্ছো?

(ডাক্তার সদাশিবের গা শুঁকিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বমির উদ্রেক হইল।)

জগবন্ধু॥ ওয়াক! কিসের গন্ধ?

সদাশিব॥ গোবরজল।

(বলিয়াই শিশি হইতে কিছুটা সেন্ট নিজের গায়ে ঢালিলেন এবং ডাক্তারের গায়ে ছিটাইয়া দিলেন।)

জগবন্ধু॥ গোবর জল তোমার গায়ে? সে কি?

সদাশিব॥ আমার মাথায় ঢালা হয়েছে।

জগবন্ধু॥ কে ঢাললো?

সদাশিব॥ নাম বলতে যখন সাহস পাচ্ছি না, তখন তোমার বোঝা উচিত ডাক্তার। ঘুমন্ত দৈত্যকে তুমি জাগিয়েছ।

জগবন্ধু॥ বুঝলাম। কখন ঢাললেন? আর কেনই বা ঢাললেন?

সদাশিব ॥ কাল রাতে খেতে বসেছি। আমার দোষের মধ্যে কেবল বলেছি, ডালটা পুড়ে গেছে—কেমন একটা পোড়া গন্ধ পাচ্ছি। ব্যস। ঘর নেকানো গোবর, জলে গুলে এক গামলা মাথায় ঢেলে জিজ্ঞেস করলেন, পোড়া গন্ধটা কি এর চেয়েও বেশী। সারারাত কতবার গায়ে সাবান ঘসেছি, নেয়েছি—গন্ধটা তাও গেছে বলে মনে হচ্ছে না। অধিকন্তু লেগেছে সর্দি, বুকে হয়েছে ব্যথা।

জগবন্ধু ॥ তুমি দেখছি সক্রেটিস হয়ে গেছো প্রফেসর।

সদাশিব ॥ সক্রেটিস! কেন?

জগবন্ধু ॥ বা, তুমি প্রফেসর মানুষ, জানো না? সক্রেটিসের স্ত্রী জ্যানথিপি ছিলেন—স্বামীব ওপর তর্জনগর্জনে অদ্বিতীয়।

সদাশিব ॥ অদ্বিতীয়? তা হতে পাবেন কারণ তখন আমার দিগম্বরী দেবী জন্মান নি।

জগবন্ধু ॥ তা' বটে—তা' বটে। কিন্তু অত তর্জনগর্জনেও সক্রেটিস উত্তেজিত হতেন না দেখে, একদিন জ্যানথিপি স্বামীর মাথায় ঢেলে দিলেন এক গামলা নোংরা জল। তাতেও সক্রেটিস ধৈর্যচ্যুত হলেন না। হাসি মুখে বললেন, মেঘ গর্জনের পর বারি বর্ষণই স্বাভাবিক।

সদাশিব ॥ ঠিক এ কথাটা আমি বলতে পারি নি ভাই, তবে তখনকার তাঁর মূর্তিটি দেখে আমি বলেছিলাম, এ যেন গোবরে পদ্ম ফুল ফুটেছে দেখছি। প্রতিবাদ করিনি বলেই রক্ষে। নইলে আর এক গামলা—হ্যাঁ, তার মাল—মসলা তৈরী ছিল। তা ঐ এক গামলাতেই—

জগবন্ধু ॥ দেখি তোমার বুকটা (বুকে ষ্টেথিসকোপ লাগাইয়া) সর্দি পাচ্ছি। ক'বার চান করেছিলে বললে?

সদাশিব ॥ তা' বার দশেক।

জগবন্ধু ॥ (হাসিয়া) 'ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস'। আচ্ছা আমি ওষুধ দেব। কিন্তু উনি আমাকে ডেকেছিলেন কেন?

সদাশিব ॥ পরশুদিন আমাকে বকাবকি করেছেন পুরো দু' ঘণ্টা। মুদির দোকান থেকে পাওনা টাকা নিতে লোক এসেছিলো, ঘণ্টা-খানেক তার সঙ্গে ঝগড়া করে, শেষে আঁষ-বটি নিয়ে তাড়া করেছিলেন। তারপর থেকেই ওঁর গলাটা একটু জখম মনে হলো।

জগবন্ধু ॥ মানে স্বরভঙ্গ?

সদাশিব ॥ হ্যাঁ, স্বরভঙ্গ। (হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া পরম অনুনয়ে) আচ্ছা ভাই, ওর গলার স্বরটা ওষুধ দিয়ে কোনো মতে আবার বন্ধ করে দেওয়া যায় না? মানে যাকে বলে স্বর-লোপ—কমপ্লীট লস অফ ভয়েস।

জগবন্ধু ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে য়্যাফানিয়া হচ্ছে স্বর ভঙ্গ; আর য়্যাফাসিয়া হচ্ছে স্বরলোপ। কিন্তু ভাই তোমার দুঃখে যত দুঃখিতই হই না কেন, ডাক্তার হয়ে স্বরনাশের মত সর্বনাশটি করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, তোমাকে খানিকটা রিলিফ দিতে পারি কিনা দেখছি।

সদাশিব ॥ চুপ।

জগবন্ধু ॥ কেন?

সদাশিব ॥ আসছে।

জগবন্ধু ॥ কি করে বুঝলে?

সদাশিব ॥ দুপদাপ শব্দ। শুনছো না?

(আঁষ বঁটি হাতে দিগম্বরীর প্রবেশ)

দিগম্বরী ॥ (বঁটির ধার পরীক্ষা করিতে করিতে) নাঃ, ধারটি বেশ মনের মতই দিয়েছে। (ডাক্তারকে দেখিয়া) খুব মশাই, ডাকলাম পরশু, এলেন আজ।

জগবন্ধু ॥ অসুখ করেছিল কিনা, তাই।

দিগম্বরী ॥ অসুখ। আপনি ডাক্তার,—আপনার অসুখ! আপনি তবে কেমন ডাক্তার? এই জন্যেইতো আমার ব্যারাম সারাতে আপনার একটি বছর লাগল। আপনারই যদি অসুখ হবে

তবে আপনার কাছে কী চিকিৎসা আমরা আশা করতে পারি ? লোক ঠকিয়ে এমনি ক'রে পয়সা লুঠছেন ডাক্তারবাবু। (বঁটিটি হাতের কাছেই নামাইয়া রাখিলেন)।

জগবন্ধু॥ (ঘাবড়াইয়া গেলেও চট করিয়া সামলাইয়া লইয়া) আপনি ডাক্তারদের তবে জানেন না দিগম্বরী দেবী। ইচ্ছা ক'রে আমরা আমাদের দেহে অসুখ সৃষ্টি করি—রোগীর জ্বালা-যন্ত্রণাটা যাতে সঠিক বুঝতে পারি। হ্যাঁ, তারপরেই সুচিকিৎসা করে আবার ব্যাধিটা সারিয়ে ফেলি। এ যে আপনি জানেন না, এ তো আমি জানতাম না।

দিগম্বরী॥ জানিনা মানে ? সিভিল সার্জনের পাশের বাড়ির মেয়ে আমি। কথাটা তুলে আপনাকে বাজিয়ে নিলাম। (স্বামীর প্রতি) খুব সেন্টের গন্ধ পাচ্ছি যে।

সদাশিব॥ তুমি এসেছ তাই।

দিগম্বরী॥ ঠাট্টা হচ্ছে—ঠাট্টা ?

জগবন্ধু॥ (হাত ঘড়িটি দেখিয়া) আমার একটা জরুরী য়্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে দিগম্বরী দেবী। আপনার কি অসুখ বলুন।

দিগম্বরী॥ গলাটা একটু ভেঙেছিল। না ভেঙে উপায় আছে ? কি করে যে আমার দিন যায়, জানেন শুধু মা গঙ্গা। কি সব লোক নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়, জানেন না তো।

জগবন্ধু॥ বটেই তো। সংসার মানেই আজকাল একটা যুদ্ধ। রাত দিন চেঁচাতে হবেই। আপনি তবু পারেন, এতকাল বোবা ছিলেন, গলার জোরটা খরচ হতে পারেনি, তাই। কিন্তু, আমাদের বৌ-ঝিরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছে।

দিগম্বরী॥ কিন্তু আমার সেই গলা—তাও ভাঙবার মত হয়েছিল—তবেই বুঝুন, ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে। ভয় পেয়ে আপনাকে কল দিয়েছিলাম।

সদাশিব॥ কলটা আমিই দিতে বলেছিলাম, কারণ মানুষের গলাই যদি গেল, তবে কি রইলো।

দিগম্বরী ॥ (স্বামীকে) ঠাট্টা হচ্ছে!—ঠাট্টা হচ্ছে!—ঠাট্টা? (ডাক্তারকে) দু'টি ঘণ্টা সমানে আমাকে বকিয়ে যখন দেখলেন আমার গলা দিয়ে আর কথা বেরুচ্ছে না, তখন বললেন ডাক্তার ডাকো—যাকে বলে জুতো মেরে গরু দান—বুঝলেন ডাক্তারবাবু?

জগবন্ধু ॥ বুঝেছি, বুঝেছি। তা' এখন গলাটা তো দেখছি বেশ—

দিগম্বরী ॥ বেশ! বেশ মানে কি?

জগবন্ধু ॥ না, আগেকার মত বাজখাই গলা যদিও নেই—

দিগম্বরী ॥ বাজখাই! বাজখাই মানে?

জগবন্ধু ॥ (কোনঠাসা না হইয়া) মানে, গলার যে জোরটা ছিল, এখন সেটা একটু—

সদাশিব ॥ তবু এখনো যা রয়েছে—

দিগম্বরী ॥ ঠাট্টা হচ্ছে—ঠাট্টা? (সখেদে) দেখুন ডাক্তারবাবু, এখনও আমার গলায় যা ব্যথা—

জগবন্ধু ॥ বটেই তো—বটেই তো! একটু হাঁ করুন, আপনার গলাটা একটু দেখি। (ব্যাগ খুলিয়া গলা দেখিবার যন্ত্র বাহির করিতে করিতে) গলার ব্যারাম উপেক্ষা করতে নেই। বিশেষ, আপনার। আবার বোবা না হন।

সদাশিব ॥ দেখ ডাক্তার দেখ, সেরকম যদি কিছু হয়—

জগবন্ধু ॥ (দিগম্বরীকে) না, না, আর একটু হাঁ করুন।

(দিগম্বরী বড় হাঁ করিল, ডাক্তার যন্ত্রপাতি দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন)

সদাশিব ॥ কি বুঝছ ডাক্তার? আশাপ্রদ মনে হচ্ছে কি?

জগবন্ধু ॥ দাঁড়ান মশাই, দেখতে দিন।..... ...হাঁ? তাইতো—

(পরীক্ষা শেষ হইল)

দিগম্বরী ॥ কি বুঝছেন ডাক্তারবাবু! হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন যে?

জগবন্ধু ॥ ব্যাপারটা আমি বাংলা করেই বলছি, আপনার কেসটা য়্যাফানিয়া থেকে য়্যাফাসিয়া'য় যাবার পথে। আচ্ছা, আপনার গলা কুটকুট করে?

দিগম্বরী ॥ করে, এখনও করছে।

ডাক্তার ॥ গলা শুকিয়ে যায় ?

দিগম্বরী ॥ হ্যাঁ, তা' যায়—

ডাক্তার ॥ শুষ্ক খুসখুসে কাশি, শ্বাসকষ্ট, গলা সাঁই সাঁই বা হাঁস পাস করা—

সদাশিব ॥ মানে, তুমি বলতে চাইছ ডাক্তার, স্বরযন্ত্র অত্যধিক চালনা করার সব উপসর্গ—

দিগম্বরী ॥ তুমি থামো। না চেঁচিয়ে এ সংসার চালাবার উপায় আছে ? শ্বাসকষ্ট কি, নাভিশ্বাস উঠে যায়।

জগবন্ধু ॥ বটেই তো—বটেই তো। তাতেই বোধ হয় ঐসব উপসর্গ এসে গেছে। কিন্তু এখন যা বুঝছি সেটা ভাল নয়।

দিগম্বরী ॥ কি বুঝছেন আপনি ?

জগবন্ধু ॥ স্বরযন্ত্রে পক্ষাঘাত আসন্ন। দেখলাম কিনা, স্বরতন্ত্রে আঘাতিতবৎ স্পর্শ-দ্বেষ, খঞ্জতা ও ঘৃষ্টতা অনুভব। মানে পেশীর আভিঘাতিক পীড়া দেখা দিয়াছে। বাংলায় বলছি এইজন্যে যাতে বুঝতে পারেন।

দিগম্বরী ॥ কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝলাম না ডাক্তারবাবু।

সদাশিব ॥ কেন, এতো পরিষ্কার বাংলা কথা। স্বরযন্ত্রের অত্যধিক সংঘর্ষণে ও নিষ্পেষনে গণ্ডদেশে ঘৃষ্ঠবৎ স্পর্শ-দ্বেষ।

দিগম্বরী ॥ তুমি থামো। (ডাক্তারকে) ভয়ের কিছু কি দেখছেন ডাক্তারবাবু ?

জগবন্ধু ॥ এই তো বললাম। ব্যাপারটা সত্যিই একটু জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। য়্যাফানিয়া থেকে য়্যাফাসিয়ায় এসে যাচ্ছে। এক্ষুনি সাবধান না হলে একেবারে স্বরলোপ, যাকে বলে বাকরোধ।

সদাশিব ॥ মানে বোবা হতে হবে। হায় হায়! উনি যদি বোবা হন, আমার কি করে চলবে ডাক্তার ? সংসার যে একেবারে অচল হয়ে যাবে।

দিগম্বরী ॥ (স্বামীকে) ভেবেছ তুমি রেহাই পাবে ? না ডাক্তার, বোবা আমি হতে পারবো না, কিছুতেই পারবো না, বোবা হওয়া আমার চলবে না। আপনি আমার চিকিৎসা করুন। যে ওষুধ দেবেন, আমি খাবো, যা বলবেন আমি শুনবো।

জগবন্ধু ॥ না না, এত উতলা হবেন না আপনি। ঠিক সময়মত রোগটা যখন ধরা পড়েছে, ওষুধ খেলে—আমার কথা মত চললে—

দিগম্বরী ॥ (চীৎকার করিয়া) সে তো আমি বলেছি—

জগবন্ধু ॥ চুপ! আপনি আর একটিও কথা কইবেন না। আমার চিকিৎসার এইটিই হলো গোড়ার কথা। অন্ততঃ তিন মাস কথা বলা আপনার একেবারে বন্ধ।

সদাশিব ॥ তিনমাস!

দিগম্বরী ॥ তিন মাস!

জগবন্ধু ॥ আবার! আবার কথা বলছেন আপনি! এক একটি কথা বলছেন আর আপনার স্বরতন্ত্রে ঘা লাগছে। স্বরতন্ত্র জখম হচ্ছে। স্বরতন্ত্রের পেশী পক্ষাঘাতের দিকে এগুচ্ছে।

দিগম্বরী ॥ (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমি চুপ করছি ডাক্তারবাবু।

জগবন্ধু ॥ একথাটা বলাও আপনার উচিত হলো না।

সদাশিব ॥ বটেই তো!

(দিগম্বরী স্বামীর পানে অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।)

সদাশিব ॥ কথা বলা বন্ধ, একথাটা এখন মনে থাকলে হয়।

জগবন্ধু ॥ মনে রাখতেই হবে। এই নির্দেশটা কাগজে বড় বড় করে লিখে উনি যেখানে যেখানে চলা ফেরা করেন, সেখানে সেখানে ঝুলিয়ে রাখা উচিত। আচ্ছা, আমি ওষুধের প্রেসক্রিপশানটা লিখছি।

(তথাকরণ)

সদাশিব ॥ কৈলাস! কৈলাস! শিগগীর আয়।

(একটু আড়ালে অবস্থিত হৃষ্ট কৈলাস ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল)

কৈলাস ॥ আজ্ঞে কর্তা!

সদাশিব ॥ খানকত বড় কাগজ আর লাল পেন্সিলটা নিয়ে আয়।

(কৈলাসের তথাকরণ)

জগবন্ধু ॥ এই রইলো একটা মিক্‌চার। আর রইলো একটা গলার পেন্ট।

(সদাশিব বড় কাগজে লাল পেন্সিল দিয়া কথা না বলার নির্দেশটি বড় বড় করিয়া লিখিলেন।)

জগবন্ধু ॥ যাকে বলে একেবারে কমপ্লিট রেষ্ট—আপনার এখন তাই আবশ্যক—অন্তত তিনটি মাস। খুব লঘু পথ্য খাবেন।

সদাশিব ॥ এই রে! আচ্ছা, আচার টাচার?

জগবন্ধু ॥ না—না।

সদাশিব ॥ সর্বনাশ। ভাঁড়ারে এত আচার—একা আমি পারব কি!

দিগম্বরী ॥ কেন, তোমার সেই কেকা দেবীকে ডেকে এনো।

জগবন্ধু ॥ সর্বনাশ! আবার কথা! স্বরযন্ত্রে পুঁজ হোক এইটাই কি আপনি চান?

দিগম্বরী ॥ (রাগিয়া গিয়া) চায়—চায়, ও লোকটা তাই চায়।

জগবন্ধু ॥ (ঠোঁটে আঙুল দিয়া দিগম্বরীকে কথা না বলিবার নির্দেশ দান)

দিগম্বরী ও! (থামিয়া গেলেন)

সদাশিব ॥ যাতে মনে থাকে—এই জন্যে টাঙিয়ে দিচ্ছি। কৈলাস! এটা টাঙিয়ে দে।

[কৈলাস লেখাটি সকলের সামনে ধরিল।]

জগবন্ধু ॥ (পাঠ) 'কথা বলিলেই কথা বন্ধ।' হ্যাঁ, লেখাটা ঠিকই হয়েছে। (কৈলাসকে) ঘরে ঘরে এমনি সব টাঙিয়ে দাও। (দিগম্বরীকে) আপনি ভাববেন না, তিনটি মাস এসব নিয়ম মেনে চলুন, তখন দেখবেন মুখে আবার খৈ ফুটবে। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

[ডাক্তারের প্রস্থান। কৈলাস ইতিমধ্যে কাগজটি দেওয়ালে টাঙাইয়া দিয়াছে, এবং সদাশিব কর্তৃক লিখিত ঐরূপ আর একটি কাগজ ঘরের অন্যত্র লাগাইতে ব্যাপৃত হইল। বলা বাহুল্য—সে মহা খুসি।]

সদাশিব ॥ বাড়ীতে কাক চিল বসতে পেত না—এখন বসবে। পথ থেকে লোক সব ছুটে এসে জিজ্ঞেস করতো, মশাই আপনার

বাড়ীতে ব্যাপার কি? আমাকে বলতে হতো কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে। যাক, তিন মাস আর বোধ হয় তা' বলতে হবে না।

দিগম্বরী ॥ হাতি গর্তে পড়লে ব্যাঙ লাথি মারে—এ দেখছি তাই।

সদাশিব ॥ (নির্দেশনামার তৃতীয় কাগজখানি চট করিয়া দিগম্বরীর সম্মুখে ধরিল।)

দিগম্বরী ॥ আমি ওসব মানবো না।

সদাশিব ॥ সেই সুমতিই তোমার হোক দিগম্বরী। কথা বল—বল কথা—গলায় হোক পুঁজ—স্বরতন্ত্রে পক্ষাঘাত হোক। চিরতবে বোবা হও। তবেই যদি বাঁচি।

(দিগম্বরী সত্য সত্যই ভয় পাইলেন। ভাগ্যচক্রে যেন একেবারে বেকুব বনিয়া গেলেন। ফ্যাল ফ্যাল চোখে সদাশিবের মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সদাশিব সস্নেহে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।)

সদাশিব ॥ না-না, কেঁদনা লক্ষ্মীটি, ওতেও স্বর যন্ত্রটা জখম হতে পারে। ভাবছো কেন, তিনটে মাস তো! এতকাল তুমিই বলেছ, আমি শুনে গেছি। এবার আমি বলবো, তুমি শুনে যেও। কোনো অসুবিধা হবে না। তোমার না বলা বাণী আমি শুনবো—বুঝবো। ছিঃ! কেঁদো না।

[ক্রন্দনরতা দিগম্বরীর মাথায় সস্মিত মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহির হইতে কেকার প্রবেশ।]

কেকা ॥ একি!

[সদাশিব ইঙ্গিতে তাহাকে থামাইলেন, চলিয়া যাইতেও ইঙ্গিত করিলেন। দিগম্বরী চট্ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সদাশিব বিপদ বুঝিয়া নোটিসটি তাহার সামনে ধরিলেন। দিগম্বরী সংযত হইতে চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন।]

দিগম্বরী ॥ বোবা হতে হয়, হ'বো. তবু ঝেঁটিয়ে আমি পাপ বিদেয় করব। কোথায় আমার ঝাঁটা—(ছুটিয়া কক্ষান্তরে গেলেন। নেপথ্যে বাসনপত্র টেবিল চেয়ার সশব্দ হইয়া উঠিল।)

সদাশিব ॥ সর্বনাশ করেছ কেকা। রণচণ্ডী জেগেছেন। এসে পড়বার আগেই এসো পালাই—নইলে আজ আর রক্ষে নেই।

[কিন্তু পালাইবার সময়টুকুও আর নাই দেখিয়া কক্ষের ইজি চেয়ারের নীচে একজন এবং টেবিলের তলে আর একজন আত্মগোপন করিলেন।

রণচণ্ডীর মতো দিগম্বরীর পুনঃ প্রবেশ।]

দিগম্বরী ॥ পালিয়েছে! জোড়ে! কিন্তু আমারটি যাবে কোথায়। পিণ্ডি গিলতে আসতে হবে না? তখন দেখে নেব। চুপটি করে ঘুপটি মেরে পালিয়ে থাকছি দোরের আড়ালে। একবার এলেই হয়।

(দোরের আড়ালে আত্ম গোপন। লুক্কায়িত তিনজনই নীরব নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে ধীরে ধীরে যবনিকা নামিল।)

— যবনিকা —

॥ ১৩৬৫ শারদীয়া সংখ্যা 'দীপালী'তে
প্রকাশিত 'বোমা' এবং 'যষ্টিমধু'তে
প্রকাশিত 'বাঘাওলে বুনোতেঁতুল'
নাটিকাদ্বয়ের সংযোজিত
রূপান্তর ॥

হারিকেন

[তালপুকুরের পারে গৃহস্থবাড়ীর একখানি ঘরে মৃত্যু-শয্যায় শায়িত তের বছরের বালক কমল। কমলের মাথার কাছে ব'সে তার বিধবা মা ষোড়শী। মৃদু দীপালোক।]

কমল॥ মা!

ষোড়শী॥ কি বাবা!

কমল॥ এখন কত রাত্তির হবে? বারোটা বেজে গেছে...না?

ষোড়শী॥ হ্যাঁ বাবা।

কমল॥ আজ আমি কেমন আছি?

ষোড়শী॥ কালকের চেয়ে আজ ভালই আছ। এখন একটু ঘুমোও।... আমি হাওয়া করি।

কমল॥ খালি খালি ঘুমোতে আর আমার ভাল লাগে না। রাত বারোটার পর আর আমি ঘুমোতে পারি না। আমাকে ঘুমোতে দেয় না।

ষোড়শী॥ আবার?

কমল॥ হ্যাঁ মা। তুমি বিশ্বাস কর না কিন্তু যদি তুমি দেখতে—

ষোড়শী॥ ও কিছু নয়। পেটে পথ্যি পড়েনি, তাই দুর্বল হয়ে পড়েছ, তার ওপর জ্বর তো লেগেই রয়েছে। ওসব চোখের ধাঁধা।

কমল॥ না মা আমি ত সেরে উঠেছি। ডাক্তারই বলুক উঠেছি কিনা। কিন্তু শোন না কানে কানে।

ষোড়শী॥ বল বাবা।

কমল॥ আমি সেরে উঠছি......ডাক্তারের ওষুধে নয় কিন্তু। কিসে জানো?

ষোড়শী॥ কিসে বাবা?

কমল ॥ ওদের ডাকে। ওরা আমায় ভালবাসে। ওরা আমায় ডাকে! বলে 'আয়। আয়। কোলে আয়। বুকে আয়!'....মা!

ষোড়শী ॥ কি বাবা!

কমল ॥ ওদের তুমি সব সময় দেখছ...কিন্তু ওদের তুমি দেখেও দেখ না। কথা বল না...কেন? কেন মা?

ষোড়শী ॥ ওরা যে কে, তাই তো বুঝলাম না বাবা!

কমল ॥ সে কি মা। তোমাব কি চোখ নেই? কান নেই?

ষোড়শী ॥ তুই ঘুমো কমল!

কমল ॥ কেমন করে ঘুমোই! ঐ যে...মা ..ঐ যে...

ষোড়শী ॥ কই?

কমল ॥ ...ঐ...শুনছ না?

ষোড়শী ॥ ও তুপুর রাতের ঝিঁঝির ডাক।

কমল ॥ তবে তুমি কেন বলো শুনতে পাওনা!

ষোড়শী ॥ লক্ষ্মী আমার। ঘুমোও।

কমল ॥ মা! দেখেছ? দেখেছ?

ষোড়শী ॥ আবাব কি বাবা।

কমল ॥ ঐ আকাশের দিকে চেয়ে দেখ।

ষোড়শী ॥ কি?

কমল ॥ চোখ বুজে র'য়েছো বুঝি। মুঠো মুঠো তারা...চোখে পড়ে না? মিটি মিটি চাইছে...ভারী দুষ্টু ওবা...আমায় শুধু ইসারা করে।...মা।...তালপুকুরের জলে নেমে ওরা খেলা করে। কালো জলে ওদের ঝিকিমিকি ভারি ভাল লাগে। আমার কি ইচ্ছে হয় জানো মা?

ষোড়শী ॥ কি বাবা?

কমল ॥ ওদের সঙ্গে ঐ কালো জলে সাঁতার কাটি...খেলা করি।... তালপুকুরের মাছগুলোও কম নয়...রাত দিন ছুটো ছুটি। চোখে একটুও ঘুম নেই। কি নিয়ে ওদের এত মাতামাতি মা?

ষোড়শী ॥ জানিনে বাবা।

কমল ॥ কিছুই জানো না তুমি। চারিদিকে এত খেলা, এত ইসারা, এত হাত ছানি—সে দিকে লক্ষ্য নেই। শুধু জানো ঐ ডাক্তারকে। ...হয়তো ঐ ডাক্তার কিছু কিছু জানে মা। আমি দেখেছি, ডাক্তার তোমাকে মাঝে মাঝে ইসারা করে, হাতছানি দিয়ে ডাকে। ও ডাকের মানে কি ও জানে! আমি জানিনে মা...! কথা ব'লছ না যে।

ষোড়শী ॥ তুমি যদি না ঘুমোও কমল, তবে আমি ভারি রাগ করব কিন্তু।

কমল ॥ আমি ঘুমোব না। কিছুতেই না। ডাক্তার এলে আজ তাকে জিজ্ঞেস ক'রে জানব, ঐ ইসারা, ঐ হাতছানির মানে কি?

ষোড়শী ॥ এতরাতে ডাক্তার আসবে না। আর তুমি তো আজ ভালই রয়েছ বাবা।

কমল ॥ আমার ভালো লাগছে না মা, বড় কষ্ট হচ্ছে। যাও মা, ডাক্তারকে ডাকো।

ষোড়শী ॥ তাকে কি ব'লবি?

কমল ॥ শুধু একটা কথা!

ষোড়শী ॥ কি?

কমল ॥ ওর মানে কি?

ষোড়শী ॥ কিসের মানে?

কমল ॥ ঐ ইসারার, ঐ হাতছানির। যেই জানব, অমনি ও বাড়ীর বীণাকে ডেকে পাঠাব। ওকে চমকে দেব। অমনি ইসারা ক'রব। অমনি হাতছানি দিয়ে ডাকব।

ষোড়শী ॥ এসব ভালো কথা নয় বাবা। বলতে নেই। তুমি ঘুমোও।

কমল ॥ বাঃ, ডাক্তার যদি পাবে, আমি পারব না কেন? তারারা পারে, জোনাকীরা পারে, তালপুকুর পারে, ঘরের ঐ মাটির দীপটা পারে, আমি পারবনা কেন?...মা দেখেছ? মাটির দীপ হাসছে! কাঁপছে!

ষোড়শী ॥ তোকে নিয়ে যে আমি বিপদে প'ড়লুম দেখছি।

কমল ॥ ডাকো ডাক্তারকে।

ষোড়শী ॥ না, কোন দরকার নেই। তুমি ঘুমোও।

কমল ॥ মা! তবে সর্বনাশ হবে ব'লছি।

ষোড়শী ॥ সে আবার কি?

কমল ॥ হ্যাঁ, সর্বনাশ। যে আমার কথা শোনে না সে আমায় ভালোবাসে না। আমায় ভালো না বাসলেই সর্বনাশ।

ষোড়শী ॥ কি সর্বনাশ?

কমল ॥ হ্যাঁ, তুমি আমার কথা শুনছ না, তুমি আমায় ভালোবাস না।

ষোড়শী ॥ সে কি বাবা?

কমল ॥ শোন মা, ওরা ব'লেছে......ওরা ব'লেছে......। মা......এক গ্লাস জল দাও।......গলা শুকিয়ে আসছে।

ষোড়শী ॥ তুমি ঘুমোও কমল।

কমল ॥ তুমি জল দাও মা!

ষোড়শী ॥ রাত দুপুরে ঠাণ্ডা জল খাওয়া ঠিক হবে না বাবা·· দুধ দোব?

কমল ॥ জল! জল! এক গ্লাস জল!

ষোড়শী ॥ নাও বাবা।

কমল ॥ আঃ......বুক জুড়িয়ে গেল। এইবার শোন মা—

ষোড়শী ॥ এবার ঘুমোও বাবা।

কমল ॥ ওরা আমায় বলে..... তোকে আমরা ভালোবাসি......খুব ভালোবাসি। এত ভালবাসি যে ইচ্ছে হয় তোকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খাই। যখন বলে, আমার মনে হয় ওরা আমায় বুঝি গিলে খাবে।

ষোড়শী ॥ তবেই বুঝছ ওরা লোক ভালো নয়।

কমল ॥ কিন্তু ওরা আমার কাছে আসতে পারে না। সাহস পায় না, কেন পায় না জিজ্ঞেস করলেই বলে, আমাদের এগোবার জো নেই, কেন জানো?

ষোড়শী ॥ কেন বাবা?

কমল ॥ ব'ললো, 'তোর মা তোকে আমাদের চাইতেও বেশী ভালোবাসে। তোর মা'র ভালোবাসা যতই কমবে, আমরা ততই এগিয়ে আসব।'

ষোড়শী ॥ শোন বাবা, ওরাই ভূত। রাম রাম বল! রাম রাম বল!

কমল ॥ ভূত। ভূতের বুঝি অমন সুন্দর সুন্দর চেহারা হয়?

ষোড়শী ॥ ওরে কমল! তোব অসুখ কি তবে বেড়েছে? আমি যে কিছুই বুঝে উঠতে পাবছি নে।

কমল ॥ ডাক্তারকে ডাকো, ডাক্তারকে ডাকো।

ষোড়শী ॥ এই আঁধার রাতে সে আসবে কেমন ক'রে?

কমল ॥ ডাক্তাব কেমন করে আসবে সে জানো তুমি।

ষোড়শী ॥ সেদিন এলেন, আঁধাব রাতেই চলে এলেন, সঙ্গে একটা লণ্ঠনও আনেন নি। আঁধার রাতে সাপের ভয়। সেদিকেও লক্ষ্য নেই। আমার লজ্জা করে বাবা তাঁকে রাত্রে ডাকতে।

কমল ॥ তবে ডেকো না মা।

ষোড়শী ॥ কাল ভোরে ডাকলে হয় না বাবা?

কমল ॥ ভোর অবধি কি আমায় ধ'রে রাখতে পারবে মা।

ষোড়শী ॥ কি যে অলক্ষুণে কথা বলিস কমল! [পাশেব ঘবের দরজায় গিযে] ভুলু! ভুলু! ওরে ভুলু! [দরজা খুলে ভুলু সামনে এসে দাঁড়ালো] ডাক্তারকে গিয়ে বল কমল ডাকছে। এখনি যেন একবার আসেন। সঙ্গে যেন আলো আনেন।

ভুলু ॥ তিনি সঙ্গে আলো আনেন না। বলেন, তিনি তো এখনো চোখের মাথা খান নি।

ষোড়শী ॥ তবে না হয় তুই-ই আমাদের হারিকেনটা নিয়ে যা।

ভুলু ॥ ঐ একটাই তো হারিকেন মা, যদি এখানে হারিকেনের দরকার হয়?

ষোড়শী ॥ ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। তুই হারিকেন নিয়ে যা। নিয়ে যাস বুঝলি?

ভুলু ॥ নিয়ে যাবো মা। [দরজা বন্ধ করে চলে গেল]

ষোড়শী ॥ কমল! তুমি না হয় একটু ঘুমোও। ডাক্তার এলে আবার ডেকে তুলব।

কমল ॥ না মা ঘুমোব না। ডাক্তার এলেই তার পানে চেয়ে থাকব। দেখব, আজ দেখব, ভালো ক'রে দেখব। তার চোখের কথা, চোখের ইসারা, হাতছানি।

ষোড়শী ॥......তোকে বুঝি ইসারা করে?

কমল ॥ আমাকে নয়, তোমাকে! মা, একটা গান গাও না!

ষোড়শী ॥ তুমি বড় দুরন্ত হ'য়ে উঠেছে কমল।

কমল ॥ তুমি আমায় বকছ মা?

ষোড়শী ॥ দুষ্টুমি ক'রলে বকব না তো কি ক'রব?

কমল ॥ তুমি আমায় ভালোবাসা না মা?

ষোড়শী ॥ ভালোবাসি কমল, আমার মানিক! আমার মণি। আমার সোনা। আমার লক্ষ্মী! আমার......আমার...

[কমলকে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করলেন]

কমল ॥ তাই অত আদর ক'রে আমায় ভোলাচ্ছ মা! বাইরে কি ঝড় উঠল? ঐ যে......ঐ যে মা......উঃ।

ষোড়শী ॥ তাই তো বাবা! র'সো আমি জানলা বন্ধ করে দিয়ে আসি।

কমল ॥ [চীৎকার ক'রে] না মা। না—

ষোড়শী ॥ ও-ঘরে জানলার ধারে টেবিলের ওপর ডাক্তারের দামী ওষুধগুলো রয়েছে, ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যাবে বাবা।

কমল ॥ যাও। কিন্তু আমার ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করতে পারবে না।

[ষোড়শী চলে গেল]

আঃ কি সুন্দর। ঐ ঝড় উঠছে। গাছপালা নাচছে! কাঁপছে। দুলছে! তারারা নাচছে। কেন নাচে? বাঃ বাঃ, প্রদীপের আলো নাচছে! কেন নাচে? কি চমৎকার নাচে! দেখি [উঠে প্রদীপ হাতে নিল। প্রদীপ মুখের কাছে ধরে দেখতে লাগল... হঠাৎ প্রদীপের আলো তার জামায় ধরে গেল] মা! মা। আলো আমায় ধরেছে!

আগুন! আগুন! ভারী সুন্দর! কিন্তু পুড়ে গেলুম, জ্বলে মলুম!

[হাত থেকে প্রদীপ পড়ে নিভে গেল। ষোড়শী ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেই চীৎকার করে উঠলেন, "সর্বনাশ" এবং সঙ্গে সঙ্গেই জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলে আগুন নিভিয়ে ফেললেন]

ষোড়শী॥ কমল! কমল! বাবা আমার!

কমল॥ মা, ভা—রি সু—ন্দ—র। কিন্তু পুড়ে গেলুম, জ্ব—লে গে—লু—ম! আমায় ই—সা—রা করেছিলো · হাতছানি দিয়ে... ডে—কে—ছিলো! ...আলো জ্বা—লো! আবার দে-খি।

ষোড়শী॥ ভুলু! ভুলু...সর্বনাশ! দেশলাইটা পর্য্যন্ত তার কাছে!

কমল॥ হারিকেন? [ষোড়শী নীরব]

কমল॥ মা! হা—রি—কে—ন কই?

ষোড়শী॥ ভুলু নিয়ে গেছে।

কমল॥ কেন? [ষোড়শী নীরব]

কমল॥ আলো আনো মা, আলো আনো। আমার গায়ে জল ঢালো, আমার স্নান করিয়ে দাও—

ষোড়শী॥ না বাবা জল নয়। আমি ভুলুর ঘরে আলোর খোঁজে যাই।

[ভুলুর ঘরে প্রস্থান]

কমল॥ জল! জ্বলে গেল!—ঐ তালপুকুরের কালো জল [জানলার কাছে গিয়ে] নাচে! নাচে! কালো জল নাচে! কালো জলের বুকে তারারা নাচে, খেলা করে ...জল! জল! জ্বলে গেল [অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে দরজা খুলল] মা! তুমি সরে গেছ, আর ঐ ওরা আমার কাছে এসেছে। [চীৎকার করে] ডাকছে মা, আমায় ডাকছে! ঐ ইসারা...ঐ হাতছানি! মা! মা! ওরা আমার হাত ধরল! আমায় নিয়ে গেল! আমায় জড়িয়ে ধরে নিয়ে গেল!

[বাইরে চলে গেল। অন্য দরজা দিয়ে লণ্ঠন হাতে ভুলু ও ডাক্তারের প্রবেশ]

ভুলু॥ মা! মা!

ডাক্তার॥ কমল কই ভুলু? [ছুটতে ছুটতে ষোড়শীর প্রবেশ]

ষোড়শী॥ লণ্ঠন এনেছ?

ডাক্তার ॥ কমল কই ষোড়শী ?

[ষোড়শী শয্যার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, কমল সেখানে নেই। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলেন কমল নেই। কিন্তু সেই মুহূর্তেই নজরে পড়ল তালপুকুরের দরজা খোলা। তখনই, "সর্বনাশ!" ব'লে সেই দিকে ছুটে যেতেই ডাক্তার তাঁর হাত ধ'রে ফেললেন]

ডাক্তার ॥ কমল কোথায় ?

ষোড়শী ॥ হাত ছাড়ো......হাত ছাড়ো......তুমি এসেছ... তাই সে চলে গেছে।

[কপালে করাঘাত করতে করতে লুটিয়ে পড়ল।]

—যবনিকা—

॥ বিচিত্রা—কার্তিক, ১৩৩৪

একটা পাপ

[সহরতলীর রেলের গার্ড কৃপাণ বসুর বাস গৃহের কদ্ধদ্বার শয়ন কক্ষ। রাত্রি। গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। সদ্য বিবাহিত কৃপাণের তরুণী স্ত্রী ইলা শয়ন কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়নে দাঁড়াইয়া বাহিরে অন্ধকারের দিকে তাকাইয়াছিল। শিয়ালের ডাক এবং ঝিঁঝির কলরব। শয়ন কক্ষের সম্মুখে তাহার স্বামী কৃপাণের কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল। ইলা ইহাতে বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়িল।]

কৃপাণ ॥ রাত দুটো বাজতে না বাজতেই কি ঘুমবে বাবা।

[সজোরে কড়া নাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ডাকিতে লাগিল।]

কৃপাণ ॥ ইলা। ইলারাণী। বলি শুনছো? ওগো—।

[কৃপাণের বিধবা মা কৃপাণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

মা ॥ কি হ'লরে বাবা—বাড়িতে ডাকাত পড়লো নাকি?

কৃপাণ ॥ দেখতো মা, তোমার বৌমার কি কুম্ভকর্ণী ঘুম।

মা ॥ তোর কড়া নাড়ায় পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙে গেল—ঘরের বৌ'র ঘুম ভাঙছে না। কি জানি বাপু, নতুন বৌ—তার এত ঘুম কেন রে বাবা, [চেঁচাইয়া] বলি ও বৌমা—বৌমা। [কৃপাণকে] না বাবা, নতুন বৌর চাল চলন আমি ভালো বুঝছি না। জেগে ঘুমুচ্ছে।

কৃপাণ ॥ [চেঁচাইয়া] বলি খুলবে না দরজা ভাঙবো?

[ইলা দরজা খুলিল, এবং ঘোমটা টানিয়া দিয়া একটু আড়ালে গেল। কৃপাণ ও মা ঘরে ঢুকিলেন।]

মা ॥ তোমার যা চাল-চলন দেখছি বৌমা, লোকের কাছে এখন মুখ দেখানো দায়। বাছার আমার রেল গার্ডের চাকরি, সারা দিন খেটে খুটে এসে বাড়ীতে যদি এই কুরুক্ষেত্র হয়, তবে বল মা তারা দাঁড়াই কোথায়।

[মা চলিয়া গেলেন। কৃপাণ শয়ন কক্ষের দরজা বন্ধ করিয়া দিল]

কৃপাণ ॥ কি কেলেংকারী বলো তো। গার্ডের চাকরী—রাতে ডিউটি থাকলে বাড়ী ফিরতে এমনি রাত হয়েই থাকে, তবু এই আশা নিয়ে ঘর পানে ছুটি—নতুন বৌ, রাত জেগে পথ চেয়ে বসে আছে। তা কিনা—

[ঘরের ভিতর সিগারেটের গন্ধ পাইল এবং বার কতক নাক টানিয়া নিঃসন্দেহ হইল।]

কৃপাণ ॥ ঘরে সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছি।

ইলা ॥ সিগারেট। কই, না তো!

কৃপাণ ॥ হ্যাঁ। আমি কৃপাণ বোস। জীবনে কখনো সিগারেট ছুঁইনি। কাজেই তার গন্ধটা আমার নাকেই লাগবে বেশী। ইলা, বল ঘরে কে এসেছিলো।

ইলা ॥ তুমি বলছো কি?

কৃপাণ ॥ [পুনরায় নাক শুঁকিয়া] হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি ঠিক বলছি। এখনি এঘরে সিগারেট খেয়ে গেছে কেউ। এখনো তার কড়া গন্ধ পাচ্ছি। কে খেয়েছে সিগারেট? কে এসেছিল ঘরে? [বাতায়নটি উন্মুক্ত দেখিয়া] জানালটা খোলা—[ছুটিয়া জানালায় গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া চারিদিকে দেখিয়া] কে ওখানে? [কোনো সাড়া না পাইয়া ইলার সামনে ফিরিয়া আসিয়া] ভেবেছিলে আমি রেলের গার্ড। রাতে নাও বা ফিরতে পারি। ভাগ্যিস ফিরেছিলাম তাই আজ ধরতে পারলাম—কেমন বৌ আমি ঘরে এনেছি।

ইলা ॥ শোনো—শোনো—

কৃপাণ ॥ কি আবার শুনবো? হাতে-নাতে ধরা পড়ে গিয়েও আবার কথা বলছো? (রাগের চোটে ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া চেঁচাইয়া ডাকিতে লাগিল) মা, মা,! শিগগীর শুনে যাও।

[ইলা কাঠের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।]

কৃপাণ ॥ আমি তখনি মাকে বলেছিলাম—সহরের মেয়ে ঘরে এনো না। মা তোমার রূপ দেখে মজে গেলেন।

[মায়ের প্রবেশ]

মা ॥ কি বাবা, ব্যাপার কি ?

কৃপাণ ॥ অত কড়া নাড়াতেও দরজা খুলছিলো না তোমার বৌ। কেন জানো ?

মা ॥ কেন বাবা ?

কৃপাণ ॥ ঘরে তখন লোক ছিল।

মা ॥ সে কি।

কৃপাণ ॥ হ্যাঁ মা। জানালা দিয়ে তাকে পাচার করে তবে দরজা খোলা হয়েছে।

মা ॥ না, না, এ তুই কি বলছিস বাবা !

কৃপাণ ॥ ঘরের ভেতর এসো মা। সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছো ? হ্যাঁ— এখনো তো রয়েছে।

মা ॥ (নাক শুঁকিয়া) তাই তো। সিগারেটেব গন্ধ তো ! বৌমা, তোমার চাল-চলন ভালো বুঝিনি এটা সত্যি—কিন্তু তুমি যে এতদূর অধঃ-পাতে গেছ—ছিঃ ছিঃ ছিঃ !

কৃপাণ ॥ এই বৌ নিয়ে আমাকে ঘর করতে হবে মা ?

মা ॥ আগেকার দিন হলে মাথা মুড়িয়ে, ঘোল ঢেলে লাথি মেরে বের করে দিতেন এমন বৌকে কর্তারা। ছিঃ। ছিঃ। ঘেন্নায় মরছি। এখন কর্তা তুমি, যা করতে হয় করো।

কৃপাণ ॥ এতক্ষণ আমি ওকে খুন করিনি কেন তাই ভাবছি।

মা ॥ না—না—বাবা, ওসব খুন খারাপি থাক। হাতে দড়ি পড়বে— শত্রু হাসবে। রাত ভোর হোক, মানে মানে এ পাপ বিদেয় হোক বাপের বাড়ী। হ্যাঁ বাবা, কাল ভোরে ঐ কুলটার মুখ দেখতে হয়না যেন আমাকে।

ইলা ॥ শুনুন মা, আপনার পায়ে পড়ছি, শুনুন।

মা ॥ কি আবার শুনবে ? ঐ চাঁদপানা মুখের দুফোঁটা চোখের জল দেখে কচি ছেলে তোমার কথায় ভুলতে পারে, আমি ভুলবো না। এক কাপড়ে এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে কাল সকালে।

[মা চলিয়া গেলেন। কৃপাণ দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।]

কৃপাণ॥ কুলটা। মা ঠিকই বলেছেন।

ইলা॥ আমি কুলটা—এ কথা শোনার পর আর কিছু বলতে আমারও ঘেন্না হচ্ছে।

কৃপাণ॥ চোরের মা'র বড় গলা—আমাদের দেশে একটা কথা চালু আছে। কথাটা দেখছি মিথ্যে নয়। কিন্তু আমি ভাবছি এ-ই যদি তোমার মনে ছিল, এ বিয়েতে তুমি রাজি হলে কেন? যে বাবুটি, থুড়ি, যে দাদ'টি আজ ঘরে এসেছিল, তাকে বিয়ে করতে বাধাটা ছিল কি? ও, বুঝেছি, দাদাটি হয়ত বেকার, তাই বাপ মা'র হয়ত অমত হলো। আব তুমিও বুঝলে, আমার যখন রেল গার্ডের চাকরি—মাসের মধ্যে অনেকগুলো রাত তোমার ঘরটা খালিই থাকবে—রথ দেখা হবে, কলা বেচাও চলবে।

ইলা॥ অভদ্র তুমি—ইতর তুমি। এক নিমিষে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, তুমি আমাকে কতটা ভুল বুঝেছ। কিন্তু তোমাদের ইতরামিতে সে প্রবৃত্তি আর আমার নেই। রাত ভোর হবার অপেক্ষাও আমি আর কবতে চাইনে। আমি চলে যাচ্ছি এখনি।

কৃপাণ॥ অত সহজে আমি তোমাকে ছাড়তে পারিনে ইলা দেবী। তোমার গুপ্ত প্রেমের কাহিনীটা আমি সবিস্তারে শুনে রাখতে চাই। কারণ তোমার নাগরটিকেও আমার জানা আবশ্যক। অতীতটা উদ্ঘাটন কর দেবী।

ইলা॥ (চট কবিয়া তাহাব বালিশেব তল হইতে এক তাড়া চিঠি বাহিব করিযা সে চিঠির তাডা কৃপাণের দিকে ছুড়িয়া দিয়া) আমার অতীতটা যাই হোক, তোমার অতীতের চেয়ে বেশী চিত্তাকর্ষক নয়। তোমার ভালবাসার মিসেস ডলি পলের ঐ হৃদয় বিদারক চিঠিগুলো পড়েই তবে আমি একথা বলতে পাচ্ছি।

কৃপাণ॥ (চিঠির তাড়াটি তুলিয়া তাহা পকেটে পুরিল) হুঁ, চিঠিগুলো তবে পড়েছ—তার মানে, আমার বাক্সটাক্স সব ঘাটা হয়েছে।

ইলা ॥ হ্যাঁ, তা হয়েছে। তবে নিশ্চিন্ত থাকো—কিছু হারায়নি। ডলি পলের সঙ্গে নানা পোজে তোলা তোমার মনোরম ফটোগুলোও যথাস্থানেই আছে। আচ্ছা, আমি তবে আসি।

[যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।]

কৃপাণ ॥ দাঁড়াও। শোন।

ইলা ॥ বল।

কৃপাণ ॥ আমি বলছিলাম কি, তুমি এভাবে চলে গেলেও কেলেংকারীটা কিছু কম হবে না।

ইলা ॥ হোক। উপায় কি?

কৃপাণ ॥ উপায় হয়ত এখনো আছে।

ইলা ॥ আমি কুলটা—একথা শোনার পর আর কিছু আমি শুনতে চাই না।

কৃপাণ ॥ অতীত সবারই থাকে। আমারো আছে, তোমারও আছে। অস্বীকার করছি না, মিসেস্ ডলি পল, আমার জীবনে সত্যি সত্যিই একদিন এসেছিল ঝড়ের মতো। বিশ্বাস কর ইলা, আমার জীবনের সে ঝড়টা কেটে গেছে। আর কেটে গেছে বলেই আমি বিয়ে করতে পেরেছিলাম তোমাকে। এমনি একটা ঝড় হয়ত তোমার জীবনেও উঠেছিল। কিন্তু আজ যখন তুমি আমার সঙ্গে ঘর বেঁধেছ, তোমার মনের দোর-জানলাগুলো বন্ধ রেখে সে ঝড়টাকে ঠেকানোই কি উচিত ছিলনা ইলা?

ইলা ॥ তোমার এ কথাগুলো আমার শুনতে কেন যেন বেশ ভাল লাগলো। মনে হচ্ছে বেশ প্রাণ খুলেই তুমি কথা কইলে।

কৃপাণ ॥ তুমিও বলো। তুমিও প্রাণ খুলেই আমায় সব বলো। এ যুগের যা ধারা তাতে আপোষ করে না চললে উপায় নেই। ভুল ভ্রান্তি মানুষের হয়—মানুষ যখন তা বোঝে, তাকে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। চেষ্টাটা যদি আন্তরিক হয় জীবনের অনেক গরমিল দূর হয়ে যায়। প্রাণ খুলে যদি তোমার কাহিনীটা বল, হয়ত

আবার আমরা একটা পথ খুঁজে পেতে পারি ইলা! (ক্ষণিক নিঃস্তব্ধতার পর) তোমাকে হারাতে আমার কষ্ট হচ্ছে ইলা।

[মনে হইল কৃপাণের কথাগুলি ইলার মনে দাগ কাটিল। সে ক্ষণকাল কি ভাবিল। তাবপর হঠাৎ স্বামীব মুখোমুখি ঘুরিয়া দাঁড়াইল]

ইলা ॥ তুমি বসো, আমি বলছি, কিন্তু আমার একটু সময় লাগবে।

[ইলা চট কবিয়া তাহার ক্যাশ বাক্সটির কাছে গিয়া চাবি দিয়া বাক্সটি খুলিল—খুলিয়া একটি সিগারেট কেস হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া উহা মুখে লইয়া দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরাইল, এবং সিগারেট টানিতে টানিতে স্বামীর সম্মুখে আসিল।]

কৃপাণ ॥ (সবিস্ময়ে চীৎকাব করিয়া উঠিল) ইলা!

ইলা ॥ বলো—

কৃপাণ ॥ তুমি—তুমি সিগ্রেট খাও।

ইলা ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল—হুঁ।)

কৃপাণ ॥ আমি আসবার আগে তবে তুমিই সিগ্রেট খাচ্ছিলে?

ইলা ॥ (মাথা নাড়িয়া জানাইল-হুঁ) আমার দাদা ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানীর সেলসম্যান। নেশাটা ধরেছিলাম লুকিয়ে। বিয়ের পরও বদ অভ্যাসটা—

কৃপাণ ॥ এত কাণ্ড হয়ে গেল, অথচ এ কথাটা একবার বললে না?

ইলা ॥ বলবার সময় দিলে কৈ? আর, শাশুড়ীর সামনে এ কথাটা বলবারও নয়! বাঙালী ঘরের মেয়েদের এটা এখনো একটা পাপ।

কৃপাণ ॥ কিন্তু আমার কাছেও তো চুপি চুপি বলতে পারতে।

ইলা ॥ সারা জীবনে তুমি সিগ্রেট ছোঁওনি। আমি সাহস পাইনি।

কৃপাণ ॥ ইলা! আমার ইলা! (স্ত্রীকে বুকে চাপিয়া ধরিল।)

— যবনিকা —

॥ বনফুল—অগ্রহায়ণ—১৩৬৫ ॥

ওলট-পালট

[কলিকাতার উপকণ্ঠে ফাল্গুনী চৌধুরীর বাসস্থান। ফাল্গুনী চৌধুরীর বয়স পঁচিশ কিন্তু ফিল্মের গল্প লিখিয়া কিছু নাম ও অর্থ দুই-ই উপার্জন করিয়াছে। অষ্টাদশী তরুণী চিত্রাঙ্গদা গুপ্তা ফাল্গুনীর গুণমুগ্ধা বান্ধবী ছিল, এক্ষণে ফাল্গুনীর স্ত্রী এবং সদ্য বি-এ পাশ করিয়া সহরতলীর "আদর্শ শিক্ষা সদন"-এ শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্তা। ফাল্গুনী ও চিত্রাঙ্গদার সংসারটিতে তৃতীয় ব্যক্তি হইতেছে একটি কিশোরী দাসী—নাম আগুন।

সন্ধ্যাকাল। উপবেশন কক্ষে গল্প লেখায় রত ফাল্গুনী।]

ফাল্গুনী॥ [হঠাৎ হাত ঘড়িটি দেখিয়া] এই যা! ছটা বাজে যে! [উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল] চিতু—চিতু! [কোন সাড়া মিলিল না। ফাল্গুনী আবার কলম ধরিল এবং লিখিতে চেষ্টা করিল] দূর ছাই! এমন হলে কি কেউ লিখতে পারে? ছ'টা বেজে গেল—না পেলাম এক পেয়ালা চা—না দেখছি সিনেমায় যাওয়ার কোন আশা। [পুনরায় চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল] চিতু—চিতু! কোন সাড়া নেই। নতুন ঝি-টাও হয়েছে এমন—। আমার কোন কাজ করবে না। [চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল] আগুন—আগুন! [রাস্তা হইতে এক পথিক যুবক ছুটিয়া আসিল]

যুবক॥ আগুন! কোথায় লাগলো মশাই?

ফাল্গুনী॥ আঃ কী বিপদ! কোথায় আবার আগুন লাগবে?

যুবক॥ আগুন আগুন বলে চ্যাচাচ্ছিলেন যে!

ফাল্গুনী॥ আরে মশাই আগুন আমাদের ঝি'র নাম। ঝিকে ডাকছিলাম।

যুবক॥ বলিহারী নাম! আগুনের মত চেহারা বুঝি!

ফাল্গুনী॥ বেরিয়ে যান মশাই।

যুবক॥ আমি বেরিয়ে যাচ্ছি স্যার। কিন্তু যেদিন সত্যি সত্যি আগুনে পুড়ে মরবেন সে দিন হাজার চিৎকার করলেও কেউ আসবে না।

পাড়ায় আমি সবাইকে বলে রাখছি। আমার নামটা জেনে রাখুন—অশনি হালদার। ছেলেরা শনিদা বলে ডেকে থাকে। পাড়ায় নতুন এসেছেন তাই জানেন না। একখানা ফিল্মের বই লিখে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন। ফিল্মের জগতে বাস করেন কিনা তাই নিজের নাম নিয়েছেন ফাল্গুনী, বৌ'র নাম চিত্রাঙ্গদা আর ঝি'র নামও রেখেছেন আগুন। এই আগুনেই একদিন পুড়তে হবে, সেদিন জল ঢালার লোক মিলবে না। হ্যাঁ—বলে যাচ্ছে শনিদা। [পথে নামিয়া চলিয়া গেল]

ফাল্গুনী॥ এই সেরেছে। কী হতে কী হয়ে গেল। [উঠিয়া বাহিরে যাইবার দরজাটি খিল দিয়া পুনরায় টেবিলের কাছে আসিয়া অধীরভাবে চিৎকার করিতে লাগিল] আচ্ছা এর কী কোন মানে হয়। চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙ্গে গেল তবু তোমাদের কোন সাড়া নেই।

[ভেতর হইতে রুদ্ধ দরজা খুলিয়া আগুন ঝি'র প্রবেশ। মেয়েটির নাম নেহাত বেমানান হয় নাই। কোনদিন হয়তো নীচের মহলেই ছিল কিন্তু এখন সাজসজ্জায় অনেকটা উঁচু হইয়াছে। আগুনের কোন লক্ষণ দেহে থাকুক না থাকুক চোখে আছে আর আছে কথায়।]

আগুন॥ বলুন কর্তা।

ফাল্গুনী॥ কোথায় সব থাক?

আগুন॥ দিদিমণির সাজ পোষাক করে দিচ্ছিলাম।

ফাল্গুনী॥ সাজপোষাক করতে ক'ঘণ্টা লাগে? আর ঘরে, খিল এঁটে সাজ পোষাকই বা কেন? ডাকতে ডাকতে আমার গলা ভেঙে যায়। পাড়ার লোক জড়ো হয়—ভাবে ঘরে বুঝি আগুন লেগেছে। তোমার ঐ আগুন নাম আর চলবে না। ঝি বলেই তোমাকে এখন থেকে ডাকা হবে।

আগুন॥ ডাকতে পারেন। কিন্তু কোন সাড়া পাবেন না। আমাদের মিটিঙে পাশ হয়ে গেছে ঝি চাকর বলে ডাকা চলবে না।

ফাল্গুনী ॥ তা নাহয় না ডাকলাম, কিন্তু অমন একটা অলুক্ষণে নাম—
ওটা তোমাকে বদলাতে হবে।

আগুন ॥ আমি-ই বরং মনিব বদলাব। বাপ-মা'র দেওয়া নাম
বদলাতে যাবো কেন আমি?

[চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ। অষ্টাদশী, সুন্দরী। কোমল কঠোরের সমাবেশ—
যেন শ্রীদুর্গা।]

আগুন ॥ [সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়া] আমি আর এখানে চাকরী করবো না
দিদিমণি।

চিত্রাঙ্গদা ॥ কেন, কি হয়েছে?

আগুন ॥ কর্তা বলছেন যে আমার বাপ-মা'র দেওয়া নামটা পালটাতে
হবে।

চিত্রাঙ্গদা ॥ [ফাল্গুনীকে] কেন নামটাতে কী দোষ হল?

ফাল্গুনী ॥ ঘরে খিল এঁটে তুজনে বসে থাকবে। এক পেয়ালা চা চাইতে
গিয়ে আগুন আগুন ব'লে চেঁচিয়ে ডাকছি। পথ থেকে লোক
ছুটে এল ঘরে। বলে কি না, ঘরে আগুন লেগেছে?

চিত্রাঙ্গদা ॥ চেঁচামেচি করাটাই অভদ্রতা। চায়ের সময় হয়নি এখনও।
পাঁচ মিনিট বাকী। ভদ্রঘরে সব-কিছু টাইম মাফিক হয়। কোন
কিছুর জন্যে চেঁচামেচি করতে হয় না। আগুন। চা।

[আগুন চা আনিতে চলিয়া গেল]

ফাল্গুনী ॥ ঝি'র সম্মানটাই তোমার কাছে বড় হল। খুব ওকে মাথায়
তুলেছ দেখছি!

চিত্রাঙ্গদা ॥ কাজের লোক আমি ভালবাসি। আশা করি এটা
তোমার ওপর কোন কটাক্ষ বলে তুমি মনে করবে না। তুমি
স্বামী। [হাসিয়া] সবার উপরে তুমিই সত্য তোমার উপরে নেই!

[পাশের চেয়ারে বসিল]

ফাল্গুনী ॥ বাঁচলাম! ভারী ঈর্ষা হচ্ছিল কিন্তু আমার চিতু।

চিত্রাঙ্গদা ॥ আবার চিতু!

ফাল্গুনী ॥ ও-হ্যাঁ। হুকুম হয়েছে 'চিতু' বলে ডাকা চলবে না।

চিত্রাঙ্গদা ॥ [আবদারে] তুমি আদর করে আগে যখন আমায় 'চিতু' বলে ডাকতে মন্দ লাগতো না। কিন্তু কেন যেন এখন আমার মনে হয় —এ নামটা অতি সাধারণ। নামটা যেন আমাকে মানায় না। চিত্রাঙ্গদা বলতে না চাও, কেন তুমি আমায় চিত্রা বলে ডাকো না।

ফাল্গুনী ॥ ডাকতে তাই-তো চাই, কিন্তু একটু আবেগ হলেই কেন যেন ঐ কাটখোট্টা নামটা ভুলে যাই। মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে 'চিতু'।

চিত্রাঙ্গদা ॥ এখন থেকে আমিও তোমাকে 'ফাগুন' বলে ডাকবো। ফাল্গুনী বলবো না—বলবো না।

ফাল্গুনী ॥ বাঃ বাঃ—কী সুন্দর নামটি তুমি আমায় দিলে। ফাগুন। একবার ডাকো না আমায় তুমি ঐ নামে।

চিত্রাঙ্গদা ॥ তাই নাকি। ওর চেয়েও মিষ্টি নাম তোমায় আমি দিতে পারি। দেবো ?

ফাল্গুনী ॥ কই দাও তো।

চিত্রাঙ্গদা ॥ বেগুন।

[চায়ের ট্রে লইয়া আগুনের প্রবেশ]

আগুন ॥ না না—ও বেগুন নাম আমি নেবো না। আমি যে আগুন—সেই আগুন।

[ফাল্গুনী ও চিত্রাঙ্গদা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—আগুন ট্রে টেবিলের উপর রাখিয়া রাগতভাবে চলিয়া গেল। ইহাতে স্বামী-স্ত্রী আরও হাসির খোরাক পাইল। চিত্রাঙ্গদা চা ঢালিয়া দিল।]

চিত্রাঙ্গদা ॥ কি—বেগুন নামটা পছন্দ হল ?

ফাল্গুনী ॥ তোমার পছন্দ হলেই আমার পছন্দ চিতু।

[চিতু নামে চটিয়া গিয়া চিত্রাঙ্গদা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

ফাল্গুনী ॥ কেন—কী হল।

চিত্রাঙ্গদা ॥ আবার চিতু

ফাল্গুনী ॥ এই দেখ। একটু আবেগ এলেই আমার কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়। আমায় মাপ কর চিতু—মানে—চিত্রা—মানে চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা ॥ [না হাসিয়া পারিল না] আচ্ছা এই শেষবার মাপ করলাম।

ফাল্গুনী ॥ বাঁচলাম। না না—এ ভুল আর আমি করবো না। যদিও ভুল করবো না বললেও মানুষের ভুল হয়। যেমন তোমার।

চিত্রাঙ্গদা ॥ আমি আবার কী ভুল করলাম ?

ফাল্গুনী ॥ আজকে সিনেমায় যাওয়ার কথাটা একেবারেই ভুলে গেছ।

চিত্রাঙ্গদা ॥ সিনেমায় আজকে তোমার লেখা বই হচ্ছে ?

ফাল্গুনী ॥ না। আমার বই তো কাল বেস্পতিবার উঠে গেছে।

চিত্রাঙ্গদা ॥ বলেছিলাম তোমার বইটা আর একবার দেখবো। আজ তবে ভুলটা আমার কোথায় হলো ?

ফাল্গুনী ॥ আজ একটা ইংরেজী বই দেখবো তোমায় কতবার বলেছি। প্লটটা ভারী সুন্দর। একটু ওলোট-পালোট করে বাংলায় চালানো যায় কি না দেখবার ছিল মতলব।

চিত্রাঙ্গদা ॥ দু'বছর চেষ্টা করে চার জোড়া জুতোর তলা খুইয়ে একটা ফিল্মের গল্প তোমার বিক্রী হয়েছে। যে দামে বিক্রী করেছো তা মুখে আনতেও লজ্জা হয়। ভাগ্যিস আমি বি-এ পাশ করার পরই ইস্কুলের কাজটা পেয়েছিলাম তাই এখনও কপোত-কপোতী হয়ে একটা বাসা বেঁধে বাস করতে পারছি। নইলে ফুটপাতে বাঁধতে হত ঘর। এ কথাটা তুমি বার বার ভুলে যাও।

ফাল্গুনী ॥ না না—তা অবশ্য ভুলি না।

চিত্রাঙ্গদা ॥ হ্যাঁ তুমি ভোল। ঐ তো আবার ফিল্মের গল্প লিখতে বসেছো। কী হবে এ সব ছাইপাঁশ লিখে ?

ফাল্গুনী ॥ চিতু,—মানে—চিত্রাঙ্গদা, আজ তুমি একে ছাইপাঁশ বলছো, কিন্তু একদিন ছিল যেদিন গল্প লিখতে তুমিই দিয়েছিলে আমাকে উৎসাহ, প্রেরণা।

চিত্রাঙ্গদা ॥ তখন আমরা কেউ সংসারে ঢুকিনি। জগতটা ছিল তখন আমাদের আলাদা। জীবনটা ছিল তখন স্বপ্নের। আজ বুঝছি সে জীবন, সে জগৎ কী মিথ্যা। স্পষ্ট বুঝছি জীবনটা আমার পালটে যাচ্ছে। জগৎটা আমার বদলে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি

বদলে যাচ্ছি। [হঠাৎ আত্মস্থ হইয়া কঠোর ভাবে] বি-এ'র পাঠ্য বইগুলো ধুলো ঝেড়ে আমি সাজিয়ে রেখেছি তোমার ঐ শেলফে। গল্প লেখা ছেড়ে দিয়ে বইগুলি ধরো—আবার পড়াশুনা করো। পড়াতে আমার বেশ লাগে। আমার কাছে পড়বে।

ফাল্গুনী॥ তোমার কাছে।

চিত্রাঙ্গদা॥ না না—আমি বুঝি তোমার কাছে সেটা অপমানের হবে। [একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায়] আমার কেন এমন হয় আমি জানি না। বুঝি না কেন এসব আমার মাথায় আসে। মনে হয় আমার কোন ব্যারাম আছে।

ফাল্গুনী॥ কী হয়েছে চিতু? বল—বল। কাঁধ আর শিরদাঁড়ায় আবার কি সেই ব্যথাটা?

চিত্রাঙ্গদা॥ না-না তার চেয়েও বেশী। স্কুলে আমি পড়াই একেবারে নির্মম হয়ে। কচি কচি মেয়েরা আমাকে দেখে ভয় করে। শুধু ধমকাই না, মাঝে মাঝে আমি ওদের মারি। মুখে ডাকে অবশ্য দিদিমণি, কিন্তু আড়ালে গিয়ে বলে "বাঘা দিদি"। এমন তো আমি ছিলাম না ফাল্গুনী।

ফাল্গুনী॥ একটা মাস্টারী মাস্টারী ভাব তোমাব আগেও ছিল চিতু। কলেজে ছেলেরা তোমাব কাছে ঘেঁসতে ভয় পেত। আমি বাদে। স্কুলে চাকরী নেবার পর তোমার সেই মাস্টারী মনোবৃত্তিটা যেন আরও বাড়ছে। হ্যাঁ, সেটা আমি আজ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করছি। যদি এটা ব্যারাম বলো, ওষুধ হচ্ছে স্কুলের কাজটা ছেড়ে দেওয়া।

চিত্রাঙ্গদা॥ [রুখিয়া উঠিয়া] ছেড়ে দেবো! স্কুলের কাজ আমি ছেড়ে দেবো! বেকার বসে থেকে তুমি আমাকে এ কথা বলতে পারছো?

ফাল্গুনী॥ হ্যাঁ, বলতে পারছি। আমি বেকার হতে পারি কিন্তু বিত্তহীন নই। গ্রাম দেশে এখনও আমার ভিটে মাটি যা আছে কিছু কম নেই। যাবে সেখানে আমার সঙ্গে? চাষ-বাস করে খাবো।

মোটা ভাত কাপড়ের কোন দুঃখ হবে না। আমরা আনন্দে থাকবো। শান্তিতে থাকতে পারবো চিতু।

চিত্রাঙ্গদা ॥ আবার চিতু!

ফাল্গুনী ॥ মানে, চিত্রা। চিত্রাঙ্গদা, [একটু থামিয়া] আমার প্রস্তাবটা রাখবে?

[সম্মতির আশায় আগ্রহের সহিত চিত্রাঙ্গদার দিকে তাকায়]

চিত্রাঙ্গদা ॥ তুমি আমার স্বামী। কিন্তু আমি তোমার সে স্ত্রী নেই যে স্ত্রী স্বামীর গলগ্রহ। আমি নিজের পায়ে দাঁড়াতে জানি। কারুর অনুগ্রহ আমি নেবো না। না, তোমারও না। আমার কাছে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ একটা 'পার্টনারশিপ'। হ্যাঁ জীবনের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার আমরা।

ফাল্গুনী ॥ শুধু অংশীদার। জীবনটা কি তবে বাণিজ্য? শুধু হিসাব? সে ভালবাসা কি তাতে নেই যে ভালবাসায় ক্ষতিকেও মনে হয় লাভ—লোকসানে হয় আনন্দ। তুমি কি তবে আর আমাকে ভালবাসোনা চিত্রা?

চিত্রাঙ্গদা ॥ বাসতাম। একদিন তোমায় মনের প্রতিটি অনুভূতি দিয়ে, প্রাণের প্রতিটি অণুপরমাণু দিয়ে তোমাকে ভালবাসতাম। ছিলাম তোমার প্রিয়া, হলাম তোমার জায়া। স্বপ্ন দেখতাম জননীও হবো একদিন তোমার সন্তানের।

[একটি মনোরম শাড়ি পরিয়া আগুনের প্রবেশ।]

আগুন ॥ দিদিমণি চলো—আমি 'রেডি'।

ফাল্গুনী ॥ (বিরক্ত হইয়া) কোথায় যাবে?

আগুন ॥ আমি কী জানি! জানেন দিদিমণি।

চিত্রাঙ্গদা ॥ ও, হ্যাঁ, কিছু কেনা-কাটা আছে।

ফাল্গুনী ॥ আমি যেতে পারিনা সঙ্গে?

চিত্রাঙ্গদা ॥ না, আমার সঙ্গে না। তুমি গেলে আমি পছন্দ মত জিনিষ কিনতে পারি না। তোমার মেয়েলী রুচি আমি সইতে পারি না।

ফাল্গুনী॥ ও। কিন্তু আগুন গেলে কি করে চলে? কেউ যদি আসে এক পেয়ালা চা-ও কি সে পাবে না?

[বাহিরের দরজায় করাঘাত। সকলে চমকাইয়া উঠিল। ফাল্গুনী উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে প্রবেশ করিল ডাঃ সুবন্ধু গুপ্ত]

ফাল্গুনী॥ আরে এসো এসো সুবন্ধুদা।

চিত্রাঙ্গদা॥ ছোড়দা।

ফাল্গুনী॥ পথ ভুলে নাকি ভাই?

সুবন্ধু॥ আর বোলো না ভাই। পসার যখন ছিলো না তখন দুঃখ করতাম টাকা নেই। পসার হয়ে এখন দুঃখ সময় নেই। তোমাদের পাড়াতেই এই ভূ-কৈলাস রোডে এক রোগী দেখতে এসেছিলাম। তোমাদের সঙ্গে দেখা করার এই সুযোগটা ছাড়তে পারলাম না। কিন্তু খুকী তুই যেন কোথায় বেরুচ্ছিস মনে হচ্ছে।

চিত্রাঙ্গদা॥ একটু কেনা-কাটা করতে যাচ্ছি। তুমি যখন এসেছো যাবো আর আসবো। কতদিন বাদে দেখা। কেন যেন তোমার কথা এ কদিন বড্ড মনে হচ্ছিল ছোড়দা। আমার শরীর-মন কিছুই ভালো যাচ্ছে না। তোমাকে বসতে হবে। আমার অনেক কিছু তোমাকে আজ শুনতে হবে। তুমি বস। আমি তোমার জন্য কেক্ আর কাজু বাদাম নিয়ে আসছি।

সুবন্ধু॥ সুধু কেক্ আর কাজু বাদামে আমার পেট ভরবে না। আমার খিদে পেয়েছে। তোর হাতের সেই বাদশাহী হালুয়া ফিরে এসে করে দে। আমি বসি।

ফাল্গুনী॥ এখনি তোমার একটু চা চাই সুবন্ধুদা?

চিত্রাঙ্গদা॥ ছোড়দা চা খান না। আয় আগুন।

[আগুনকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বিজয়িনীর মত বাহিরে চলিয়া গেল চিত্রাঙ্গদা—সুবন্ধু এবং ফাল্গুনী উভয়ে মুখোমুখী বসিল]

সুবন্ধু॥ তারপর কেমন আছো ফাল্গুনী? সংসার ধর্ম কেমন চলছে বল।

ফাল্গুনী॥ আর বলে কী হবে? তুমি তো আমাদের ভুলেই গেছ সুবন্ধুদা।

সুবন্ধু ॥ না হে না, তোমাদের সব খবর আমি রাখি। আমার ঐ মামাতো বোনটা ছোটবেলা থেকেই আমার বড় আদরের ছিল। জানো তো মামার বাড়িতেই আমি ছোটবেলায় মানুষ হই। আর খুকী মানে তোমার চিত্রাঙ্গদাও ছিল আমার চুরিডাকাতির সাকরেদ।

ফাল্গুনী ॥ বটে!

সুবন্ধু ॥ বলেনি খুকী? বারে! একসঙ্গে নদী সাঁতরে পার হয়েছি। মাছ ধরেছি। চুরি করে এর গাছের আম, ওর গাছের জাম পেড়ে খেয়েছি। ঐ দস্যি মেয়েটা আমার চেয়েও ভালো গাছে উঠতে পারতো হে। গাঁয়ে স্পোর্টস হতো। তা, দৌড়ে আমরা বড়রা ওর কাছে হেরে যেতাম। ছোটবেলার সে সব স্মৃতি আজও মধুর হয়ে মনে মনে ভাসছে। বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখি তোমার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ঐ দস্যি মেয়ে শান্তশিষ্ট হয়ে যে স্বামীর ঘরকন্না করতে পারে তা দেখে অবাকই হয়েছিলাম আমি। আসতে না আসতেই বাদশাহী হালুয়া খাইয়েছিল, তা যেন আজও আমার মুখে লেগে আছে। আমার একটি খুব ইনটারেষ্টিং পেসেণ্ট তোমাদের এই পাড়ায় উঠে এসেছে জেনে ভাবলাম কেস্‌টাও দেখে আসি, তোমাদের সঙ্গেও দেখা হবে। আমার যে পেসেণ্টটি দেখতে এসেছিলাম সেটি ভারী ইনটারেষ্টিং কেস্‌ হে। যুগান্তরে কেস্‌টি বেরিয়েছে। পেসেণ্টের ছবিও ছাপা হয়েছে।

ফাল্গুনী ॥ বল কি? আমার চোখে পড়েনি তো। কী কেস্‌?

সুবন্ধু ॥ বল কি হে—গোটা দেশ তোলপাড় হয়ে গেছে এ খবরে। যদিও ডাক্তারী শাস্ত্রে এটা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। 'কাটিং'টা আমার পকেটেই আছে। এই দেখ।

[পকেট নোটবুক হইতে 'কাটিং'টি বাহির করিয়া নিজেই উৎসাহের সঙ্গে পড়িতে লাগিল]

॥ যুগান্তর ১৮ই এপ্রিল, ১৯৫৮ ॥

নুরজাহান বিবি এখন নুরুল হুদা

একদিন যিনি ছিলেন নূরজাহান বিবি, আজ সে নুরুল হুদা হইয়াছে। তাহার বয়স এখন ১৮ বৎসর; ভূকৈলাস রোডে এক বাড়িতে সে আমিনুল সর্দারের সঙ্গে বসবাস করিতেছে।

দ্বারভাঙ্গা জেলায় রুরা থানার শীর্ষা নামে ছোট এক গ্রামের ছোট মেয়ে ছিল নূবজাহান। ৪ বৎসর পূর্বে যখন তাহার বয়স প্রায় ১৪, তখন তাহাব সাদি হয়; বিবাহিত জীবন তিন বৎসরকাল অতিবাহিত হইবার পর ছয়মাস পূর্ব হইতে সে বুঝিতে আবম্ভ করে যে, তাহাব যৌন রূপান্তর আরম্ভ হইতেছে। এখন সে ১৮ বৎসর বয়স্ক কিশোর। এই রূপান্তরের পূর্বে সে প্রায় ৫ দিন ধরিয়া কাঁধ এবং শিরদাঁড়ায় ব্যথা অনুভব করিতে থাকে এবং একদিন সকালে উঠিয়া যখন সে দেখিল যে, একমাত্র মেয়েলী গলার স্বর ও ভাবভঙ্গী ছাড়া তাহার শরীরের মধ্যে স্ত্রীজনোচিত কোন চিহ্নমাত্র নাই, তখন তাঁহার বিস্ময়ের অবধি থাকে না।"

ফাল্গুনী॥ দাঁড়াও-দাঁড়াও। কোথায় ব্যথা বললে?

সুবন্ধু॥ "কাঁধ এবং শিরদাঁড়ায় ব্যথা অনুভব করিতে থাকে এবং একদিন সকালে"—

ফাল্গুনী॥ মেয়েটি দেখল সে আর স্ত্রী নয়! আশ্চর্য।

সুবন্ধু॥ শোন শোন, তারপর শোন—

"এই সংবাদ রটিয়া যাওয়াব পব স্থানীয় একজন ডাক্তার তাঁহাকে পরীক্ষা করেন এবং নূরজাহানের স্বামী যখন এই খবর জানিলেন, তাহাব পর তাঁহার কোন পাত্তা নাই।

নূরজাহান শৈশবেই পিতৃহীনা। সংসারে তাহার দুই ভাই, এক বোন। গত ১৬ই এপ্রিল সে কলিকাতায় আসে। উদ্দেশ্য দুইটি, চাকরীর চেষ্টা এবং একদা ছিলেন যিনি তাঁহার স্বামী, তাঁহার সঙ্গে দেখা করা।

এখন নূরুল হুদা কিশোর জীবনের সঙ্গে নিজেকে বেশ অনেকখানি মানাইয়া লইয়াছে; এখন সে কাজ চায়; ভাইবোনদের প্রতিপালন করিতে চায়; নিজে পড়াশুনা শুরু করতে চায়, আর সবার উপর একটি মেয়েকে সাদি করার জন্য সে উন্মুখ।”

ফাল্গুনী॥ সুবন্ধুদা—আমার ভয় হচ্ছে—আমার দারুণ ভয় হচ্ছে।

সুবন্ধু॥ ভয় হচ্ছে। কেন কিসের?

ফাল্গুনী॥ আজ কয়েকদিন থেকেই তোমার বোনের কাঁধ আর শিরদাঁড়ায় ব্যথা। অবশ্য তেমন প্রবল নয়, তবু—[বাইরে পদশব্দ পাওয়া যায়] ঐ ওরা এসে পড়েছে।

[বাহির হইতে চিত্রাঙ্গদা ও আগুন প্রবেশ করিল। সঙ্গে কিছু প্যাকেট]

সুবন্ধু॥ এই যে—এরই মধ্যে ফিরে এলি।

চিত্রাঙ্গদা॥ তোমাকে বসিয়ে রেখে দূরে যেতে মন সরলো না। হাতের কাছে যা পেলাম নিয়ে এলাম। আগুন। রান্নাঘরে জিনিযগুলো নিয়ে যা—উনুনে আঁচ দে।

[আগুন আদেশ পালন করিল।]

সুবন্ধু॥ হ্যাঁরে খুকী। তোর নাকি কাঁধে আর শিরদাঁড়ায় ব্যথা? ফাল্গুনীর ধারণা এ ব্যথা হলেই মেয়েরা হবে পুরুষ, আর পুরুষরা হবে মেয়ে।

(প্রবল হাস্য)

চিত্রাঙ্গদা॥ আমারি সব গল্প হচ্ছিল বুঝি?

(হঠাৎ যেন চটিয়া গেল)

কি গল্প হচ্ছিল তোমাদের?

সুবন্ধু॥ এ পাড়ায় যে কেসটি দেখতে এসেছিলাম সে কেস্‌টা যুগান্তরে বেরিয়েছে মায় ছবিশুদ্ধ। এরি গল্প হচ্ছিল—রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে পড়ে দেখ। মানে, হালুয়াটা করতে দেরী না হয়। আমার ক্ষিদে বেশী, সময় কম।

["কাটিং"টি তার হাতে দিল। চিত্রাঙ্গদা তাহা দেখিতে দেখিতে অন্দরে চলিয়া গেল।]

ফাল্গুনী ॥ আমার ভয় হচ্ছে—সত্যি আমার বড ভয় হচ্ছে।

[অন্দরে একটি আর্তনাদ শোনা গেল। কেহ পড়িয়া গেল এইরূপ শব্দ পাওয়া গেল।]

ফাল্গুনী ॥ ও কী।

সুবন্ধু ॥ একটা আর্তনাদ শুনলাম, কেউ পড়ে গেল না কি?

[অন্দর হইতে ছুটিয়া আসিল আগুন]

আগুন ॥ আপনারা শীগগির আসুন। দিদিমণি একটা কাগজ পড়তে পড়তে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

সুবন্ধু ॥ কোথায়?

[আগুনের পিছে পিছে সুবন্ধু অন্দরে ছুটিয়া গেল। ফাল্গুনী হাতে মুখ ঢাকিয়া হতাশ ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িল।]

॥ পর্দা ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

[এক বৎসর পরের ঘটনা। পুরুলিয়ার উপকণ্ঠে "মজুদর পল্লী"তে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃক পরিচালিত "শ্রমিক-মঙ্গল কেন্দ্রে"র পরিচালক শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরীর বাস ভবন। উপবেশন কক্ষে চিত্তরঞ্জন চৌধুরী মাতাল মজদুর রামকৃষ্ণ মহাতোর সহিত আলাপরত। আর একটি সম্ভ্রান্ত তরুণী উপবিষ্টা, তাহার নাম হিয়া ঘোষ। কাল—অপরাহ্ণ।]

চিত্তরঞ্জন ॥ আবার তুমি মদ ধরেছো!

রামকৃষ্ণ ॥ ও কথাটা আর বলবেন না স্যার। বলুন মদে আমাকে ধরলো।

চিত্তরঞ্জন ॥ তোমার চারটি ছেলেমেয়ে। তোমার স্ত্রী এলোকেশীর কাছে শুনে এলাম পেটে আর একটি এসেছে।

রামকৃষ্ণ ॥ ওর পেটের খবর ও জানবে। ও আমি জানবো না।

হিয়া ॥ কী অসভ্য!

চিত্তরঞ্জন। মদের ঝোঁকে কথা বলছে। ওর কথা এখন ধবো না হিয়া।

রামকৃষ্ণ॥ হিয়া! তবে ঠিক আছে। [গানেব স্বরে] 'লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়া বাখনু, তবু না তিবপিত ভেল'।

হিয়া॥ চিত্তদা! তুমি এখনও বলবে আমি ওব কথা ধববো না।

চিত্তবঞ্জন॥ [বিবক্ত হইষা] আঃ হিয়া!

রামকৃষ্ণ॥ আমাব কথা নয় গো—চণ্ডীদাসেব কথা। [হিযাব উদ্দেশে গান ধবিল] 'জনম অবধি হাম রূপ নেহাবনু নয়ন না তিবপিত ভেল'।

[হাউ হাউ কবিষা কাঁদিতে লাগিল।]

হিযা॥ চিত্তদা! এব পবেও তুমি আমাকে এখানে থাকতে বল!

চিত্তবঞ্জন॥ হ্যাঁ—বলি। সমাজ-সেবাব কাজ জীবনে নিতে হলে এব চেয়ে ঢেব বেশি অত্যাচার তোমাকে সহ্য কবতে হবে হিযা। আচ্ছা বামকেষ্ট—তোমাব সাহস তো কম নয়, তোমাদেব 'মিউনিসি-প্যালিটি'র চেয়াবম্যানের মেয়ে ইনি। ঐ গান গেয়ে তুমি এমন কবে ওঁকে অসম্মান করতে সাহস পাচ্ছো?

রামকৃষ্ণ॥ কী জানি স্যাব—তু'পাত্র পেটে পডলে মনেব কথা সব ডানা মেলে উডতে থাকে। কিছুতেই বেঁধে বাখতে পাবি না স্যাব। আপনাবা স্যাব মদ খান না তাই আপনাবা মনেব কথা চেপে রাখতে পাবেন। দু'পাব খেযে নিন স্যাব—আপনিও বলবেন হিয়া তমি কি সুন্দর! তোমাকে আমাব বিয়ে কবতে ইচ্ছে হচ্ছে।

হিযা॥ [ভীষণ বাগিযা] চিত্তদা!

চিত্তবঞ্জন॥ [হাসিষা] লোকে মাতাল হলে মনের কথা বলে ফেলে।... হিয়া! তুমি আমাব লাইব্রেবী ঘবে বসে বার্ষিক বিবরণীটা শেষ কবগে যাও। হ্যাঁ, তোমাব বাবা এখনি এসে ওটা চাইবেন। এ লোকটাব ভার আমি নিচ্ছি।

[হিযা পাশেব ঘবে চলিযা গেল]

বামকৃষ্ণ॥ আপনাবা যে স্যাব মদ খান না তাব কাবণ আপনাদের অনেক কিছু ঢাকবাব আছে—লুকোবাব আছে। আমবা স্যাব সরল সাদা-

সিদে লোক—আমাদের ঢাক্ ঢাক্ গুড় গুড় নেই। আমরা তাই মদ খেতে ভয় পাই না স্যার—হিঃ হিঃ হিঃ [হাসিতে লাগিল।

চিত্তরঞ্জন ॥ [চিৎকার করিয়া উঠিল] এলোকেশী। এলোকেশী।

[এলোকেশীর নাম শুনিবামাত্র রামকৃষ্ণের নেশা টুটিয়া গেল—। সভয়ে দরজার দিকে তাকাইল]

রামকৃষ্ণ ॥ ওরে বাব্বাঃ! এসেছে নাকি?

চিত্তরঞ্জন ॥ হ্যাঁ—

রামকৃষ্ণ ॥ এই নাক কান মলছি স্যার—আর মদ খাবো না।

[রামকৃষ্ণপত্নী ভীষণদর্শনা এলোকেশীর প্রবেশ। তাহাকে দেখিয়া রামকৃষ্ণ মাটিতে শুইয়া পড়িয়া নাকে খত দিয়া]

আর মদ ছোঁব না! [উঠিয়া গায়ের ধুলো ঝাড়িতে ঝাড়িতে] মদ তো নয় বিষ। খাই কেন স্যার জানেন—ঐ মাগীর জ্বালায়। একটু যদি আমার সঙ্গে ভাল মুখে কথা বলবে—একটু যদি আমায় যত্ন-আত্তি করবে। তা-ও ধরতাম না—সব কিছু মুখ বুজে সয়ে থাকতাম, কিন্তু এবার ঐ মাগী যা কাণ্ড করেছে—সেটা কী করে সই স্যার?

এলোকেশী ॥ কী কাণ্ড করেছি রে হতচ্ছাড়া মিনসে?

রামকৃষ্ণ ॥ [চিত্তরঞ্জনকে] ওকে তু'পাত্তর খাইয়ে দিন স্যার—নিজের পাপ নিজের মুখেই বলবে। বলুক আর নাই বলুক আমি সাফ্ বলে দিচ্ছি স্যার—এই রামকেষ্ট মাহাতোর ছেলে চারটি। পঞ্চম যেটি আসছে সেটি নয়।

[দৃপ্তভাবে দ্রুত প্রস্থান। এলোকেশী রাগে, ক্ষোভে স্তব্ধ হইয়া রহিল]

চিত্তরঞ্জন ॥ এলোকেশী।

এলোকেশী ॥ মিনসে মিথ্যে বলেনি। কিন্তু আমার এ পাপের দায় ওই মিনসেরই। মদ খেয়ে মাইনের টাকা উড়িয়ে দেয়। আমার চার চারটে কাচ্চা বাচ্চা—তাদের মুখে আমি কী দিই বলুন হুজুর। পথটা মিনসেই দেয় বাত্‌লে। একজনকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আসে। তারই টাকাতে চলছে সংসার। (কাঁদিয়া ফেলিয়া)

নিজের সোয়ামী-ই যদি আমার মাথা খায় দোষটা আমার কোথায় ? বল হুজুর—বল—আমার দোষটা কোথায় ?

[কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর হইতে আসিয়া দাঁড়াইল হিয়া—হাতে একটি ফাইল]

চিত্তরঞ্জন ॥ এদের কথাগুলো সব কানে গেছে তো ?

হিয়া ॥ তা আর যাবে না। মনে হল রেডিওতে একটা নাটক শুনছি। অদ্ভুত তোমার ধৈর্য চিত্তদা। তোমাকে আমি দেখি আর আশ্চর্য হই। যাদের ঘেন্না করবার কথা তাদের তুমি এত ভালবাস।

চিত্তরঞ্জন ॥ যাদের ঘেন্না করবার কথা শুধু তাদেরই ভালবাসি ?

হিয়া ॥ কি জানি তোমার মনের কথা তো আজও জানতে পারলাম না চিত্তদা। রামকেষ্টর একটা কথা আমার বেশ ভাল লেগেছে। তুমি যদি একটিবার মদ খেতে তোমার মনের কথাটা বেরিয়ে আসতো।

চিত্তরঞ্জন ॥ সেজন্য আমাকে মদ খেতে হবে না হিয়া। বরং মদ খেলে কথাগুলো নেশার ঝোঁকে জড়িয়ে যেতো—এলোমেলো হতো। যদি নিতান্তই শুনতে চাও তবে খুব স্পষ্ট ভাষায় তোমায় জানাচ্ছি যে আমার এ হিয়া—তুমি।

হিয়া ॥ আমি ! সত্যি।

চিত্তরঞ্জন ॥ কে তোমার নাম রেখেছিল হিয়া জানি না। অনেক কিছু বলার হাঙ্গামা থেকে তিনি আমায় রেহাই দিয়েছেন। [হিয়ার হাত দুখানি ধরিয়া] আমার হিয়া। কিন্তু আমি কি তোমার চিত্ত ?

হিয়া ॥ [দুহাতে চিত্তরঞ্জনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সস্মিত মুখে] শুধু চিত্ত নয়। রঞ্জন।

চিত্তরঞ্জন ॥ কার পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

হিয়া ॥ [সংযত হইয়া] তবে বাবা ! [দরজার দিকে চোখ রাখিয়া—গাম্ভীর্য-পূর্ণ কণ্ঠে রিপোর্টের পাতা পড়িবার ছল করিয়া] "পুরুলিয়ার এই মজদুর উপনিবেশে শ্রমিকমঙ্গলকেন্দ্রের নিরক্ষরতা দূরীকরণ,

অস্পৃশ্যতা বর্জন এবং পানদোষ নিবারণের অভিযান শ্রীচিত্তরঞ্জন চৌধুরীর পরিচালনায় শুরু হইয়াছে।”

[মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সদানন্দ ঘোষের প্রবেশ]

চিত্তরঞ্জন ॥ আসুন কাকাবাবু! আপনার মেয়ের কাণ্ড দেখুন। আমাদের শ্রমিকমঙ্গলকেন্দ্রের বার্ষিক বিবরণী লিখেছেন কিন্তু যাঁর চেষ্টায় এবং উদ্যোগে এই শুভংকর প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে সেই নামটি, মানে, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীসদানন্দ ঘোষের নামটিই উল্লেখ করেননি।

সদানন্দ ॥ আমার নাম উল্লেখ না করবার জন্যেই হিয়াকে বলে দিয়েছিলাম বাবা চিত্ত।

চিত্তরঞ্জন ॥ কিন্তু কেন? আমরা সত্য গোপন করবো কেন কাকাবাবু?

সদানন্দ ॥ না—না, লোকে বলে এমনি সব ঢাক-বাজানো আমাদের ভোট কুড়োবার ফিকির। আমি দেখেছি এতে লাভের থেকে ক্ষতিই হয় বেশি।

চিত্তরঞ্জন ॥ তবে থাক। কিন্তু তাই বলে অবৈতনিক কর্মী আমার ডান-হাত শ্রীমতী হিয়া ঘোষের নাম উল্লেখ করতেও কি আপনার নিষেধ আছে কাকাবাবু?

সদানন্দ ॥ না—তা অবিশ্যি নেই। বরং তোমার সঙ্গে এমনি একটা মহৎ কাজে ও যে জড়িয়ে আছে এটা আমার একটা গর্ব। দশজনের কাছে তা বলতে আমার গৌরববোধই হবে বাবা।

হিয়া ॥ ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থাই করে দাও না বাবা। মানে—এই শ্রমিকমঙ্গলকেন্দ্রে আমায় একটা চাকরীই দাও না বাবা।

সদানন্দ ॥ যেখানে আমি কর্তা সেখানে তোমাকে, মানে মেয়েকে, আমি চাকরী দিতে পারি না মা—তাতে নিন্দে হবে। হ্যাঁ, এরই মধ্যে নানান কানঘুসো শুনছি। আজ আমি এসেছি সেটা রোধ করতে। মা-হারা একমাত্র সন্তান তুমি আমার। তোমার চাকুরীর কথা

উঠতেই পারে না। এখানকার কাজে চিত্তর সঙ্গে জড়িয়ে থাকবার পাকাপাকি ব্যবস্থা অবশ্য বিবেচ্য। তুমি পাশের ঘরে গিয়ে ব'স, আমি সেটা চিত্তর সঙ্গে আলাপ করে দেখছি।

[হিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল]

বসো চিত্তরঞ্জন। [উভয়ে মুখোমুখী উপবেশন করিল]

সদানন্দ ॥ আমি কী বলতে চাইছি সেটা হয়তো তুমি খানিকটা বুঝতে পেরেছো চিত্ত।

চিত্তরঞ্জন ॥ না বলবো না। কাকাবাবু।

সদানন্দ ॥ হিয়া তোমার অনুরাগিনী। যতদূর বুঝেছি তুমিও তার অনুরাগী। আমার অনুমান সত্য?

চিত্তরঞ্জন ॥ সত্য—সত্য কাকাবাবু।

সদানন্দ ॥ বেশ। কিন্তু তোমাদের বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবার আগে আমার একটি প্রশ্ন আছে। এখানে তোমার সঙ্গে আমার প্রথম যোগাযোগের ঘটনাটা স্মরণ করা আবশ্যক। প্রায় এক বৎসর আগে আমি কলকাতা থেকে পুরুলিয়া আসছিলাম রাঁচি প্যাসেঞ্জারে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় আমি ছাড়া আর যে যাত্রীটি ছিল সে হচ্ছে তুমি। মনে আছে?

চিত্তরঞ্জন ॥ হ্যাঁ কাকাবাবু।

সদানন্দ ॥ বাতি নিভিয়ে আমি শুয়ে পড়েছিলাম। তোমার হয়ত মনে হয়েছিল যে আমি ঘুমুচ্ছি. কিন্তু তোমার চাল-চলনে আমার কেমন একটা সন্দেহ জেগেছিল।

চিত্তরঞ্জন ॥ হ্যাঁ—আপনি মাঝে মাঝে টর্চ জেলে দেখছিলেন আমি কি করছি। হয়তো ভেবেছিলেন আমি চোর, চুরি করবো কিংবা ভেবেছিলেন আমি খুনে. খুনও করতে পারি।

সদানন্দ ॥ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণ দেখলাম না। শুধু লক্ষ্য করছিলাম তুমি কেন যেন ছটফট করছিলে। আমি খোলাখুলি তোমায় জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে? কেন এমন করছো? কোন উত্তর না দিয়ে তুমি কামরার দরজাটা

তাড়াহুড়ো করে খুলে ফেললে। ট্রেন তখন হু হু করে ছুটছে। আমার কেন যেন মনে হল তুমি ট্রেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়বে নীচে। ছুটে গিয়ে আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম। তুমি হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে উঠলে। মনে পড়ছে ?

চিত্তরঞ্জন ॥ মনে পড়ছে কাকাবাবু !

সদানন্দ ॥ তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলে। হ্যাঁ—পরে আমায় নিজ মুখেই তা বলেছিলে। কেমন সত্য কি না ?

চিত্তরঞ্জন ॥ হ্যাঁ—সত্য।

সদানন্দ ॥ কিন্তু তার কারণ আমাকে তুমি বলনি। শুধু বলেছিলে অতীতটা তুমি ভুলতে চাও। আমি তোমাকে আত্মহত্যা করতে দিলাম না সেজন্য তোমার ক্ষোভের অন্ত ছিল না সে-রাত্রে। আজও কি তোমার সেজন্য ক্ষোভ আছে চিত্ত ?

চিত্তরঞ্জন ॥ না—কাকাবাবু। আপনি আমাকে বুকে ধ'রে নামলেন পুরুলিয়ায়। তারপর আমার যে নতুন জীবনের ব্যবস্থা আপনি করলেন তাতে অতীতকে আমি ভুলতে পেরেছি। আজ আমার কোন ক্ষোভ নাই কাকাবাবু।

সদানন্দ ॥ ট্রেনের কামরায় সেই রাতে যে শুনেছিলাম তুমি তোমার অতীতকে ভুলতে চাও সেই থেকে আজ পর্যন্ত তোমার অতীত সম্পর্কে তোমাকে আমি কোন প্রশ্ন করেছি চিত্ত ?

চিত্তরঞ্জন ॥ না কাকাবাবু। এ আপনার পরম দয়া। আর তাতেই আমার পক্ষে আমার অতীতকে ভোলা সহজ হয়েছে, সম্ভব হয়েছে কাকাবাবু।

সদানন্দ ॥ কিন্তু চিত্ত, আজ যখন তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহের কথা উঠেছে, তোমার অতীত জীবনটি শুধু এই একটি কারণে আমার জানা আবশ্যক হচ্ছে চিত্ত।

চিত্তরঞ্জন ॥ ও।

সদানন্দ ॥ হ্যাঁ। অজ্ঞাতকুলশীল পাত্রের হাতে আমি কন্যা সম্প্রদান করতে পারি কি চিত্ত ? আত্মহত্যার চেষ্টা মানুষের মনের একটা

চরম অবস্থা। বিবেকের দংশনে মানুষ আত্মহত্যা করে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে মানুষ আত্মহত্যা করে। ব্যর্থ প্রেমে মানুষ আত্মহত্যা করে। স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করতে অসমর্থ হলে মানুষ আত্মহত্যা করে। তাই কি না?

চিত্তরঞ্জন ॥ এ ছাড়াও তো আরও কত কারণ থাকতে পারে যার জন্য মানুষ আত্মহত্যা করতে চায়। আমারও অবশ্য কোন না কোন কারণ ছিল। কিন্তু আপনাকে আমি সেদিনও বলেছি—আজও বলছি আমার অতীতকে আমি ভুলে যেতে চাই। তার জন্য হিয়ার সঙ্গে আমার বিয়েতে যদি আপনার আপত্তি হয় সে দুর্ঘটনা আমার কাছে যত অসহ্যই হোক—বিধাতার অভিশাপ হিসেবে আমার মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই কাকাবাবু।

(হিয়ার প্রবেশ)

হিয়া ॥ আমি না এসে পারলাম না বাবা। ও ঘরে বসে বসে একটা থার্ড ক্লাস রেডিও-নাটক শোনার মত ধৈর্য আর আমার নেই। যেটা একটা বাজে বিয়োগান্ত নাটক হতে যাচ্ছে—সেটাতে বাস্তব জীবনের পরশ-পাথর ছুঁয়ে দাও বাবা!

সদানন্দ ॥ রেডিও-নাটক! এসব তুই কী বলছিস হিয়া?

হিয়া ॥ মানে, বলছি মানুষের অতীতটাই কি সব? বর্তমানের কি কোন দাম-ই নেই তোমার কাছে? যে লোকটিকে এক বছর ধরে নিজের চোখের সামনে রেখে মুগ্ধ হয়েছো তার কাজে, তার চরিত্রে, তবু কি তাকে অজ্ঞাতকুলশীল বলবে বাবা?

সদানন্দ ॥ হয়ে গেল। আমার দায়িত্ব ফুরিয়ে গেল। এতে অবশ্য আমি-ই সব চেয়ে বেশি খুশি—বুঝলি হিয়া—বুঝলে বাবা চিত্ত? বিয়ে তোদের হোক। আমি তোদের সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি। তোরা সুখী হ—

[উভয়ে সদানন্দকে প্রণাম করিল]

মানবসেবার যে মহান ব্রত তোরা জীবনে নিয়েছিস তা সার্থক হোক। ওরে, শোন,—সরকার থেকে তোদের কাজের যে

ডকুমেণ্টারী ফিল্ম তুলে নিয়ে গিয়েছিল, কলকাতায় তা এখন দেখানো হচ্ছে, আমার বন্ধুবান্ধবরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি দিচ্ছে। এখানকার ছবিঘর থেকে এইমাত্র খবর পেলাম যে আজ সন্ধ্যা থেকে সেটা এখানেও দেখানো হবে। কী আনন্দ বল দেখি। সিনেমার সময় হয়ে এল। চল তোমরা আমার সঙ্গে।

চিত্তরঞ্জন ॥ আপনারা এগোন। স্নানটা সেরেই আমি আসছি।

হিয়া ॥ হ্যাঁ, আমিও শাড়িটা পালটে নেব বাবা। [চিত্তরঞ্জনকে] তুমিও কিন্তু আজ একটু সেজেগুজে—বুঝলে—হ্যাঁ। চল বাবা। [চিত্তরঞ্জনকে] তুমি তৈরী থেকো আমরা তুলে নিয়ে যাবো

সদানন্দ ॥ জয় গুরু! জয় গুরু!!

[সদানন্দ ও হিয়ার প্রস্থান—চিত্তরঞ্জন তাহাদের বিদায় দিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপর হইতে কাগজপত্র ড্রয়ারে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিতে যাইবে এমন সময় বাহির হইতে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সেখানে টেবিলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল ফাল্গুনী চৌধুরী। তাহাকে দেখিয়াই যেন ভূত দেখিয়াছে এমনি করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল চিত্তরঞ্জন]

চিত্তরঞ্জন ॥ কে!

ফাল্গুনী ॥ আমি। তোমাকে যদি আমি কলকাতায় সিনেমায় বসে ছায়াচিত্রে দেখে চিনতে পেরে থাকি, আমাকে সশরীরে দেখেও কি তুমি চিনলে না চিতু!

চিত্তরঞ্জন ॥ কেন তুমি এলে? তুমি চলে যাও—চলে যাও।

ফাল্গুনী ॥ তোমার দরজায় একঘণ্টার ওপর ব'সে থেকে আমিও যে রেডিও নাটকটা শুনলাম তার চরম পরিণতিটা আমি না দেখে পুরুলিয়া ছেড়ে কি করে যাই চিতু।

চিত্তরঞ্জন ॥ কী পরিণতি?

ফাল্গুনী ॥ হিয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে। কিন্তু আমি স্পষ্ট তোমাকে জানাতে চাই যে আমাদের জীবন-নাটকের এই পরিণতিতে আমার আপত্তি আছে। আমি জেনে এসেছি চিকিৎসা করালে চিত্তরঞ্জনের পক্ষে চিত্রাঙ্গদা হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

চিত্তরঞ্জন ॥ ওটা ভুল। তোমার বাড়ি থেকে পালিয়ে আমার গয়না বিক্রী করে মণি মুখার্জীর মত ডাক্তারকে দিয়ে আমি আমাকে পরীক্ষা করিয়েছি। তিনি 'ফি' ফেরৎ দিয়ে আমায় এই কথা বলে বিদায় দিয়েছেন যে আমি পুরুষ হয়েই জন্মেছিলাম। কিছুটা অবশ্য ত্রুটি ছিল, সেজন্য আমার বাপ মা আমাকে মেয়ে বলে মনে করেছিলেন আর তারই ফলে শুরু হয়েছিল আমার মেয়েলী জীবন। ডাঃ মুখার্জী বললেন কোন চিকিৎসাতেই আমার পুরুষে পরিণত হওয়া বোধ করা সম্ভব নয়।

ফাল্গুনী ॥ বটে! বেশ। আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই চিতু, আর তার স্পষ্ট উত্তর চাই।

চিত্তরঞ্জন ॥ বল।

ফাল্গুনী ॥ বিয়ের আগে তোমার মনে কখনও কি এ সন্দেহ আসেনি যে তুমি সত্যি সত্যি স্ত্রী না পুরুষ?

চিত্তরঞ্জন ॥ (নিরুত্তর রহিল)

ফাল্গুনী ॥ আমি উত্তর চাই চিত্রাঙ্গদা দেবী।

চিত্তরঞ্জন ॥ (সাশ্রুনয়নে) চুপ!

ফাল্গুনী ॥ বল—তোমার সন্দেহ এসেছিল?

চিত্তরঞ্জন ॥ এসেছিল। মাকে আমি সে কথা বলেওছিলাম। মা হেসে উড়িয়ে দিয়ে ছিল। তখন মনে হয়েছিল যে আমারই হয়তো মিথ্যা সন্দেহ। মেয়ে আমি ঠিকই, তবে হ্যাঁ, পুরুষালী ভাবটা হয়তো একটু বেশি। আর সেজন্য গর্বই হত আমার। মনে হত আমি যেন 'জোয়ান অব আর্ক'। কলেজে ডিবেটিং সোসাইটিতে তোমরা তার প্রমাণ পেয়েছো। কলেজ ইলেকসান ক্যাম্পেনে আমার বক্তৃতায় আগুন ঝরেছে। স্ত্রী স্বাধীনতার ধ্বজা উড়িয়েছি আমি। পুরুষের সঙ্গে নারীর সমান অধিকার দাবী করেছি আমি। তোমরা সবাই অবাক হয়ে আমার জয়গান করেছো। আমার প্রদীপ্ত মহিমায় অভিভূত হয়েছো তোমরা। তোমরা আমার নামকরণ করেছিলে 'অগ্নিশিখা'। সেদিন কে

জানতো যে আমার এই জয়ের মধ্যেই লেখা রয়েছে আমার ধ্বংস।

ফাল্গুনী॥ ধ্বংস তুমি হওনি চিত্রু। ধ্বংস হলাম আমি। তোমার রূপান্তরেও ধ্বংস হইনি আমি। কিন্তু ধ্বংস হচ্ছি এখন যখন চোখের ওপর দেখছি এত দিনের প্রেম, এতকালের প্রীতি, সুখ-দুঃখে দীর্ঘ সাহচর্য সব কিছু ভুলে, সব কিছু পায়ে দলে, তোমার রূপান্তরকে সার্থক করতে, তোমার লালসাকে তৃপ্ত করতে, আজ হাসিমুখে বিয়ে করতে যাচ্ছ এক সুন্দরী কিশোরীকে। আমি তো তোমার মত আর একটি মেয়েকে নিয়ে নতুন করে ঘর বাঁধবার মন খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি ছাড়া আর কোন মেয়েকে ভালোবাসতে কোন সাড়া পাচ্ছি না আমার মনে। বিয়ের দু'টি বছরে তোমার কাছ থেকে পেয়েছি যে প্রেম, যে ভালবাসা, তা তবে প্রেমের ছলনা—ভালবাসার বঞ্চনা? উত্তর দাও চিত্রাঙ্গদা দেবী!

চিত্রাঙ্গদা॥ তুমি ভুল করছো। তুমি আমায় ভুল বুঝেছো।

ফাল্গুনী॥ না কিছু মাত্র ভুল করিনি। ভুল বুঝিনি। হয়েছিলেই বা তুমি পুরুষ, কেন থাকলে না তুমি আমার বন্ধু হয়ে—চিরসাথী হয়ে। দুজনের জীবনের চরম এই অভিশাপকে কেন আমরা বহন করলাম না একসঙ্গে। তুমি যদি নিষ্ঠুর হতে পারো, এমনি করে ব্যর্থ করে দিতে পারো আমার জীবন, কী করে তুমি আশা করতে পারো যে আমি নীরব থাকবো?

(বাড়ির সামনে একটি গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। তার শব্দ পাওয়া গেল)

চিত্তরঞ্জন॥ (ভীত হইয়া) তুমি থামো—তুমি থামো।

ফাল্গুনী॥ (পকেট হইতে একতাড়া ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া) আমার হাতে আমাদের বিবাহিত জীবনের এই একতাড়া ফটো। এর সদ্ব্যবহার করে তবে আমি থামবো।

(সদানন্দ ও হিয়ার প্রবেশ)

হিয়া॥ [চিত্তরঞ্জনকে] এ কী। তুমি এখনও···?

সদানন্দ ॥ কই হে সিনেমার সময় যে— [ফাল্গুনীকে দেখিয়া] কে ইনি? ব্যাপার কী?

চিত্তরঞ্জন ॥ [সদানন্দকে] আমায় আজ আপনারা মাপ করুন।

ফাল্গুনী ॥ নানা—মাপ কেন? [সদানন্দকে] আমি ওর একজন আত্মীয়। অমি এসে পড়েছি বলে উনি ভাবছেন সব 'প্রোগ্রাম' উলটপালট হয়ে যাবে। (চিত্তরঞ্জনকে) এই নাও, প্যাকেটটা রাখো। চাবুক—চাবুক—তোমাকে চাবুক মারলাম -আর আমার ক্ষোভ নেই। (সদানন্দ ও হিয়াকে) চলুন সব সিনেমা দেখে আসি।

সদানন্দ ॥ আপনি কে মশাই—তাই যে জানলাম না। কাকে চাবকালেন?

হিয়া ॥ চাবুক মারলেন আপনি! কাকে?

ফাল্গুনী ॥ সে জানে ও। ওর ভাই বলতেও আমি, বন্ধু বলতেও আমি। আমার মাথায় একটু গণ্ডগোল আছে বলে কথাটা এখন স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু জানেন না তো ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারি না। (হিয়াকে) মাথার একটু গোলমাল আছে বলেই কি দিদিমণি তোমাদের সংসারে আমার মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই হবে না? হবে না?

হিয়া ॥ (চিত্তরঞ্জনকে) কী বল তুমি?

চিত্তরঞ্জন ॥ এখন বুঝছি ওকে ছেড়ে থাকা সত্যিই আমার অন্যায়।

হিয়া ॥ বেশ তো। তবে আপনি থাকবেন—থাকবেন আমাদের সঙ্গে।

সদানন্দ ॥ তা নয়তো কি। দুভাই একসঙ্গেই থাকবে। মাথার একটু গোল আছে—তা খুব মধ্যমনারায়ণ তেল ঠাসলেই হবে। (ফাল্গুনীকে) সে তুমি ভেব না বাবা—সিনেমা শুরু হয়ে গেল—চল—চল—সব চল—

(সকলকে ঠেলিয়া লইয়া চলিলেন)

॥ যবনিকা ॥

॥ জলতরঙ্গ : কার্তিক ' ১৩৬৫ ॥

মন্মথ রায়
সাহিত্যকর্ম

জন্ম বঙ্গাব্দ ১৩০৬, পহেলা আষাঢ়। বাল্যকাল হইতেই নাটক ও থিয়েটারের ভক্ত। বালুরঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠকালে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘরে' অমলের ভূমিকায় অবতরণে নাট্যজীবনের সূত্রপাত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, এবং বি, এল। ১৯২৬ হইতে ১৯৩৮ পর্যন্ত বালুরঘাটে ওকালতি করেন। এই সময়ে বালুরঘাট ইউনিয়নবোর্ড, লোকালবোর্ড, দিনাজপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড এবং দিনাজপুর স্কুল বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হন। 'ফ্রি প্রেস', 'এসোসিয়েটেড প্রেস', 'ইউনাইটেড প্রেস', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', প্রভৃতির সাংবাদিকরূপেও তিনি বহুবর্ষ জড়িত ছিলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন।

তাঁহার রচিত প্রথম একাঙ্কিকা, নাম 'মুক্তির ডাক' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় রচিত হইয়া 'ষ্টার থিয়েটার' কর্তৃক ১৯২৩ সালে অভিনীত হয়। ১৯৩৮ সালের মধ্যে 'চাঁদসদাগর', 'মহুয়া,' 'কারাগার', 'সাবিত্রী', 'অশোক', 'খনা', 'বিদ্যুৎপর্ণা', 'রাজনটী', 'রূপকথা', 'মীরকাশিম', প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখিয়া বঙ্গরঙ্গমঞ্চে একটি নূতন প্রতিভা রূপে স্বীকৃতি ও খ্যাতি লাভ করেন। তাহার দেশাত্মবোধক 'কারাগার' নাটকের অভিনয় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রাজদ্রোহমূলক বলিয়া নিষিদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রে তাঁহার রচিত 'চাঁদসদাগর', 'অভিনয়', রাজনর্তকী', (বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী), 'যোগাযোগ,' 'হস্‌পিটাল' প্রমুখ বহু চিত্রনাট্য বাংলা এবং হিন্দীতে, কলিকাতায় ও বোম্বেতে, সবাক চিত্ররূপে প্রসিদ্ধ হয়। মন্মথ রায়ের 'Court Dancer' ভারতে নির্মিত প্রথম সবাক ইংরাজী চলচ্চিত্র—মেট্রোতে প্রদর্শিত প্রথম ভারতীয় ছবি। তাঁহার রচিত 'খনা', 'রামপ্রসাদ', 'শকুন্তলা', 'লায়লিমজনু', 'সাবিত্রী', 'কারাগার', 'মীরকাশিম', 'চাঁদসদাগর', 'শ্রীশ্রীসারদা মণি', প্রভৃতি রেকর্ড নাটকগুলি বিশেষ জনপ্রিয়।

১৯৩৮ সালে তিনি বালুরঘাট ত্যাগ করিয়া কলিকাতাবাসী হইয়া ক্রমান্বয়ে 'ভাণ্ডার', 'বেঙ্গল কো-অপারেটিভ জার্ণাল' এবং 'বসুন্ধরা' পত্রিকার সম্পাদনা

করেন। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'প্রচার প্রযোজক' পদে নিযুক্ত থাকিয়া বহু তথ্যচিত্র পরিচালনা করেন। তাঁহার পরিচালিত তথ্যচিত্র 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম' আজ সুপ্রসিদ্ধ। জাতি গঠনমূলক নাটিকাভিনয় উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারবিভাগে 'লোক-রঞ্জন শাখা' গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী কার্যে বাংলা ভাষা প্রবর্তনের জন্য গঠিত 'পরিভাষা—সংসদের' যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৫৩ সাল হইতে রঙ্গমঞ্চের জন্য পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক লেখা শুরু করেন। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত তাঁহার সামাজিক নাটক 'মহাভারতী' হিন্দীতেও অনুবাদিত হইয়া ১৮৫৭—বিদ্রোহ শত বার্ষিকী উৎসবে দিল্লীতে অভিনীত হইয়া দেশবিখ্যাত হইয়াছে। আধুনিককালে তাঁহার 'জীবনটাই নাটক', 'মমতাময়ী হাসপাতাল', 'রঘুডাকাত', 'ধর্মঘট' 'পথেবিপথে', চাষীর প্রেম', 'আজবদেশ', 'উর্বশী নিরুদ্দেশ', 'শ্রীশ্রীমা', 'সাঁওতালবিদ্রোহ', 'বন্দিতা, প্রভৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক, এবং 'একাঙ্কিকা', 'ছোটদের একাঙ্কিকা', 'মরাহাতী লাখটাকা', 'কোটিপতি নিরুদ্দেশ', প্রমুখ একাঙ্ক নাট্যগ্রন্থাবলী বাংলার নবনাট্য আন্দোলনে স্মরণীয় অবদান। একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তকরূপে তাঁহার খ্যাতি ভারত সাহিত্যে ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করিয়াছে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর একটি গবেষণায় প্রকাশ: "যখন হর্নিম্যান ও গ্লাসগোর রিপারেটরী থিয়েটারের হাতে পাশ্চাত্য একাঙ্কিকা সাহিত্যের নব নব রূপ পরিগ্রহ করে চলেছিল ঠিক সেই সময়েই বাংলা সাহিত্যেও এর অনুপ্রবেশ হয়। ১৯২৩ সালে মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক' এই পথের প্রধান পথিকৃত।"

মন্মথ রায়
সাহিত্যধর্ম

"পৌরাণিক নাটক লিখিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের নাম করিতে হয়। শুধু পৌরাণিক নাটক নহে, সর্বপ্রকার নাটক আলোচনার কালে ইঁহাকে আধুনিক সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা চলে। নাটকের মধ্যে ইনি এক অনাবিষ্কৃত রহস্য এবং এক অনাস্বাদিত রস বিকাশ করিয়া দেখাইলেন। নাটকে এরূপ সুতীব্র ভাবাবেগ এবং সুপ্রখর ক্রিয়াময়তা সৃষ্টি করিতে খুব কম নাট্যকারই পারিয়াছেন। সূক্ষ্মতম অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতিটি পর্দা ইনি সুনিপুন হস্তে স্পর্শ করিয়াছেন, এই অন্তর্দ্বন্দ্বের অবিরাম সংঘাতে ইঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মর্মস্থল ছিঁড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। ইঁহার নাটকের উদ্বেলিত ভাবতরঙ্গ ঘূর্ণমান আবর্তের মধ্যে লীলা করিয়া অমোঘ অবস্থার কঠিন শিলায় নিরুপায়ভাবে আর্তনাদ করিয়া মরিয়াছে। ইঁহার নাটক দর্শনকালে চরম উত্তেজনায় মন নাচিতে থাকে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়, কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া পড়ে।"

অধ্যাপক শ্রী অজিত কুমার ঘোষ এম.এ-কৃত
"বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস"

"তাঁহার নাটকের ঘটনাসমূহ সাধারণতঃ রোমাঞ্চকর—দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়া পাঠককে রুদ্ধশ্বাসে অগ্রসর হইতে হয়। অতি আধুনিক যুগে বাহ্য নাট্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা যে অন্তর্দ্বন্দ্বের উপর জোর দেওয়া হইয়া থাকে— তাঁহার নাটক তাহা হইতেও বঞ্চিত নহে। রোমাঞ্চকর ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে নাটকীয় চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ তাঁহার নাটকের একটি প্রধান গুণ।... এই দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে একমাত্র তাঁহার মধ্য দিয়াই এই যুগে, আধুনিক যুগের সঙ্গে অতি আধুনিক যুগের সংযোগ রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।"

অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য এম.এ-কৃত
"বাঙ্গলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস"